রতাহা

বুদ্ধদেব গুহ

রুআহা

বুদ্ধদেব গুহ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯২ মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৯৮ মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অনুপ রায়
অঙ্গসজ্জা বিমান ভট্টাচার্য
কপিরাইট সোহিনী ট্রাস্ট

ISBN 81-7066-805-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ২৫·০০

আরুশার ছোট্ট বন্ধু নীরেয়ে সাটোকে

পটভূমি

আমার সবুজ বন্ধুরা,

ছেলেবেলা থেকেই আফ্রিকা সম্বন্ধে খুবই উৎসুক ছিলাম, যেমন সব অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছেলেমেয়েরই থাকে। তাইই যখন বড় হয়ে পেশার কাজে আফ্রিকা এবং সেশেল্‌স্ আইল্যাণ্ডস্-এও যাবার সুযোগ হল তখন যাঁদের কাজে যাচ্ছিলাম তাঁদের বললাম, জঙ্গল দেখিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে। তাঁরা এমন যত্নআত্তি করেছিলেন যে তা বলার নয়।

যখন সেরেঙ্গেটি, লেক মানীয়ারা, গোরোংগোরো আগ্নেয়গিরির ক্র্যাটার, কিলিম্যান্‌জারো, ভুটু ইত্যাদি জায়গাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি একটি ভক্সওয়াগন-কম্বি ট্রুরারে গাড়িতে তখনই আমার ভাড়া গাড়ির ড্রাইভার-কাম-গাইড রুআহা ন্যাশনাল পার্ক-এর কথা বলে। তানজানীয়া আর কেনীয়ার ভিসা ছিলই আমার কাছে। তাইই ঠিক করলাম যে, আরুশা থেকে ডার-এস্-সালাম-এ ফিরেই রুআহা যাব।

রুআহার গল্প নিয়েই রুআহা।

এই বই কবে বেরুচ্ছে এ প্রশ্ন তোমাদের মধ্যে অনেকেই করেছ আমাকে ফোনে, চিঠিতে, সাক্ষাতে। এতদিনে তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া গেল।

ঋজুদা ও রুদ্রর সঙ্গে এবার তিতির,একটি সাহসী সপ্রতিভ মেয়েও চলেছে আফ্রিকায়। ঋজুদার ভবিষ্যতের অনেক অভিযানেই এই তিতির সঙ্গী হবে। আমার কিশোরী পাঠিকারা নিশ্চয়ই তিতিরকে নিয়ে গর্বিত হবে।

ভবিষ্যতে ঋজুদা, রুদ্র ও তিতিরের সঙ্গে রুদ্রর অন্য এক বন্ধুও জুটে যাবে। খুব মজার ছেলে সে। তার নাম ভট্‌কাই। দেখি, তাকে তোমাদের পছন্দ হয় কী না।

আশা করব রুআহা তোমাদের কেমন লাগল তা জানাবে।

আফ্রিকার জঙ্গল নিয়ে আমার বড়দের জন্যেও একটি বই আছে, তার নাম 'পঞ্চম-প্রবাস'। আফ্রিকা নিয়ে ভবিষ্যতে আরো অনেক লেখার আছে। সময় করে উঠতে পারলেই লিখব।

—তোমাদের প্রীতিধন্য ইতি

বুদ্ধদেব গুহ

এই লেখকের অন্যান্য বই

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
বনবিবির বনে
মউলির রাত
শুশুনোগুম্বারের দেশে
টাঁড় কাথোরা
অ্যালবিনো
অতুর শ্রাবণ

বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, "তোকে ঋজু ফোন করেছিল।"

"কিছু বলেছে?"

"তোকে ফোন করতে বলেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বই-খাতা ফোনের টেবিলেরই এক পাশে নামিয়ে রেখে ফোন করলাম।

একবার বাজতেই ফোনটা ধরল ঋজুদা। বলল, "কে রে? রুদ্র?"

"হ্যাঁ। ফোন করেছিলে কেন?"

"আলবিনো।"

"মানে?"

"মুলিমালোয়া থেকে বিষেণদেওবাবু এসেছেন। আমার এখানেই আছেন। ভানুপ্রতাপ অ্যারেস্টেড। জামিন পায়নি। যেভাবে পুলিশ কেস সাজিয়েছে প্রমাণ-সাবুদ দিয়ে, তাতে ফাঁসি না-হলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অবধারিত।"

বললাম, "আহা! এখন যেন দুঃখ হচ্ছে তোমার! কী?"

"ভানুপ্রতাপ তো প্রায় তোরই সমবয়সী ছিল। দুঃখ কি আর তোরই হচ্ছে না?"

"জানি না।"

"বিষেণদেওবাবু তোকে দেবার জন্যে ঊর গ্রীনার বন্দুকটা আর একটা পয়েন্ট-টু-সেভেন-ফাইভ রাইফেলও নিয়ে এসেছেন। বলতে গেলে, একেবারেই নতুন। লাইসেন্স্ করাতে হবে। আর শোন্, আজকে রাতে আমার এখানে খাবি তুই। আরও একটা ভীষণ খবর আছে।"

"কী?"

"খবর পেলাম, ভুবুণ্ডাকে নাকি পুব-আফ্রিকার তানজানিয়ার আরুশা

শহরে দেখা গেছে। আমার খোঁড়া-পায়ের বদলা নেবার সময় এসেছে। আমায় গুগুনোগুম্বারের দেশে যেতে হবে। বুঝেছিস?"

"সত্যি?" আমি খুব উত্তেজিত গলায় বললাম। "কবে যাচ্ছি আমরা?"

"যে-কোনোদিন গেলেই হল। কিন্তু একটা মাইনর প্রবলেম দেখা দিয়েছে।"

"প্রবলেম? কী প্রবলেম?"

"একজন সুন্দরী মহিলা আমাদের সঙ্গী হতে চান।"

"মহিলা?" আমার নাক কুঁচকে গেল। আফ্রিকার জঙ্গলে ভুষুণ্ডার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাবে মহিলা নিয়ে? নিজেই তো গতবার মরতে বসেছিল। আর—

বললাম, "ইমপসিবল্। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি যাব না তাহলে।"

"আহা! তুই যে এত বড় মেল-শভিনিস্ট হয়ে উঠেছিস, তা তো জানতাম না। তবে, আমিও যে মহিলা-টহিলাদের একেবারেই পছন্দ করি না তা তো তুই জানিসই। তার সবচে বড় প্রমাণ এই যে, মহিলা ছাড়া কারো সঙ্গে পুরুষের বিয়ে হয় না বলে আমার তো বিয়েই করা হল না। তবে এই মহিলার রাইফেলের হাত শুনছি নাকি তোর চেয়েও ভাল। গাড়িও চালাতে পারে। ইংরিজি ও ফ্রেঞ্চ ছাড়া, সোয়াহিলিও জানে নাকি একটু-একটু। একেবারে নাছোড়বান্দা! কী করি বল তো রুদ্র? মহা মুশকিলেই পড়েছি।"

আমার মাথার মধ্যে বান্টুদের ড্রাম বাজছিল। রাগে কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। বললাম, "কী বললে তুমি একটু আগে? আমার চেয়েও ভাল হাত রাইফেলে? একজন মহিলার? তা তো তুমি বলবেই। ওয়াণ্ডারোবোদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে আনলাম আর তুমি এ-কথা বলবে না! তুমি আজকাল সত্যি খুবই অকৃতজ্ঞ হয়ে যাচ্ছ।"

মনে হল, একটু চাপা হাসি হাসল ঋজুদা। বলল, "আহা, চটছিস কেন? তুই আপত্তি না-করলে তো আর সে আমাদের সঙ্গে যেতে পারছে না। আমি তাকে বলেই দিয়েছি যে, তুই-ই হলি ডিরেক্টর অব

অপারেশানস্। তোর কথাই শেষ কথা। তুই-ই আমার মালিক।"

"এমন গ্যাস দিতে পারো না তুমি!"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "ভটকাই বেচারার কত যাবার ইচ্ছা ছিল।"

"ও তো রাইফেল-বন্দুক ধরতে পর্যন্ত পারে না। ওর জীবনের দায়িত্ব কে নেবে? তুই? ভটকাইকে নিয়ে যাব তখনই, যখন আলবিনোর মতো কোনো রহস্য-টহস্য ভেদ করার ভার পড়বে আবার আমাদের উপর। ভটকাই, বর্ন-গোয়েন্দা তোরই মতো। ভটকাইকে তালিম-টালিম দিয়ে তোর চেলা বানিয়ে ফ্যাল্। তারপর—"

আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেছিল মহিলার কথা শুনে। বললাম, "নাম কী সেই মহিলার? বয়স কত?"

"বলছি, বলছি, সবই বলছি। বয়সে তোর চেয়ে সামান্য ছোট, দেখতে একেবারে মেমসাহেবের মতো। আর নাম হচ্ছে তিতির।"

"তিতির? মানে? মডার্ন হাই স্কুলের? তাকে তো আমি খুবই চিনি। প্রথত সেনের বোন? সে কোত্থেকে এসে ভিড়ে গেল তোমার কাছে? বাব্বাবাঃ! মহা ন্যাকা, নাক-উঁচু মেয়ে। না, ঋজুদা! তাকে সঙ্গে নিলে আমিই যাব না।"

"আঃ! এত কথা পরেই হবে'খন। তুই আয়ই না সন্ধেবেলা।" বলেই বলল, "রুদ্র, গদাধর তোকে জিজ্ঞেস করছে, কী রান্না করবে? কী খাবি?"

আমি রেগে বললাম, "জানি না। খাব না।" মেয়ে! আফ্রিকার জঙ্গলে মেয়ে!

"দেরি করিস না। সাতটার মধ্যে আসিস কিন্তু। আজকাল তো রোজই ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে বিকেলের দিকে।"

বলেই, ফোন ছেড়ে দিল ঋজুদা।

মা আমার উত্তেজনা লক্ষ করেছিলেন। বললেন, "কোন্ তিতির?"

"মডার্ন গার্লস স্কুলের ভারী নাক-উঁচু মেয়ে একটা। দ্যাখো মা ঋজুদার নির্ঘাৎ মাথার গোলমাল হয়েছে। মেয়ে-ফেয়ে নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে যেতে চায়। ভুষুণ্ডার গুলি খেয়ে নিজেই একেবারে গুলিখোর হয়ে গেছে।

মেয়েরা—"

মা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "বীরপুরুষ। আমিও কিন্তু মেয়ে। বীরপুরুষের মা। মেয়ে বলে কি মানুষই নয় তিতির? আমি ওর কথা শুনেছি নীপাদির কাছে। সবদিক দিয়ে খুবই ভাল মেয়ে। তার মা-বাবার আপত্তি না থাকলে তোর আপত্তির কী? মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে ছোট?"

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। গভীর চক্রান্ত। ঘরে-বাইরে অতি সুগভীর চক্রান্ত চলেছে আমার বিরুদ্ধে।

সাতটা নাগাদ গিয়ে ঋজুদার ফ্ল্যাটে পৌঁছতেই "অ্যাল্‌বিনোর" মালোঁয়ামহল-এর বিষেণদেওবাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "আও বেটা, মেরে লাল।"

তিতির আমাকে দেখে বলল, "হাই! রুদ্র।"

দেখলাম, একটা রঙ-চটা জিনস্ পরেছে। উপরে হলুদ গেঞ্জি। মাথায় পনি-টেইল্।

আমি উদার হাসি হেসে বললাম, "ভাল আছ? প্রযত্নদা কেমন?"

জবাব না দিয়ে ও বলল, "তুমি কেমন আছ বলো। ডিবেটে হেরে গিয়ে খুব রেগে রয়েছ বুঝি এখনও?"

ঋজুদা কথা ঘুরিয়ে বলল, "আমাদের সকলেরই এক্ষুনি একবার বেরোতে হবে তিতির। আমার ডিরেক্টর অব অপারেশানস্ তোমার রাইফেল ও পিস্তল শুটিং-এর পরীক্ষা নেবেন।"

"আমি?" বললাম, লজ্জায় মরে গিয়ে।

ঋজুদার মতো অন্যকে বে-আব্রু, বে-ইজ্জত করতে আর কেউই পারে না।

ঋজুদা গদাধরকে বলল, "গদাধর, রাইফেল, পিস্তল সব গাড়িতে তোল্। বিষেণদেওবাবু যে রাইফেলটা এনেছেন, সেটাও।"

গদাধর ভিতরে গেল।

ঋজুদা দেওয়ালে ঝোলানো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটাকে দেখিয়ে বিষেণদেওবাবুকে বললেন, "বিষেণদেওজি, মুলিমালোঁয়ার অ্যাল্‌বিনো বাঘ

রুদ্রবাবু মারতে পারেনি ঠিকই, কারণ বাঘ তো সেখানে ছিলই না। কিন্তু এই বাঘটি ওরই মারা। সুন্দরবনের ম্যান-ইটার। গদাধরের বাবাকে এই বাঘই খেয়েছিল, 'বনবিবির বনে'।"

বিষেণদেওবাবু স্তুতির চোখে তাকালেন আমার দিকে।

চোখের আড়ালে দেখলাম, তিতির সেনের চোখেও অ্যাপ্রিসিয়েশান ঝিলিক মারছে। ভাবলাম, মেয়েটাকে যতখানি নাক-উঁচু ভাবতাম, ততখানি সত্যি-সত্যি না-ও হতে পারে।

তিতির আমার দিকে প্রশংসার চোখে চেয়ে বলল, "সত্যি। কী সাহস তোমার রুদ্র! আই অ্যাড্‌মায়ার য়ু।"

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, "এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে রাতের বেলা শুটিং কম্‌পিটিশান করতে কোথায় যাবে ঋজুদা? চাঁদও নেই। অন্ধকার, তার উপর এই দুর্যোগ।"

ঋজুদা বলল, "আমাদের ভুষুণ্ডা-চাঁদ তো তোমাকে উজ্জ্বল চাঁদনি রাতে দেখা না-ও দিতে পারে। যাচ্ছি, জেঠুমণির কোন্‌চৌকির খামারবাড়িতে, ডায়মণ্ডহারবার রোডে। ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

জোকা পেরিয়ে একটু গিয়েই ডান দিকে কোন্‌চৌকিতে ঋজুদার জেঠুমণির খামারবাড়ির সামনে পঁচিশ একরের ধানখেত। চারপাশে বিরাট গভীর নালা। বাঁধের মতো আছে। প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঝাঁকড়া পেয়ারা গাছে চারকোনা টিনের ছোট-ছোট বাক্সর উপর সাদা রঙ করে দড়ি দিয়ে ঝোলানো। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় ডালপালা উথাল-পাতাল করছিল। টিনগুলোও পাগলের মতো নাচানাচি করছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, কতগুলো সাদা বিন্দু।

"প্রথমে আমি।" ঋজুদা বলল। বলেই, থ্রী-টু পিস্তলটা খাপ থেকে বার করে নিয়ে পরপর তিনটি গুলি করল ওয়াড্-কাটার দিয়ে।

একটিও লাগল না।

আমি বুঝলাম, ঋজুদা ইচ্ছে করেই মিস্ করল। তার মানে, আফ্রিকাতে তিতিরকে নিয়ে যাবেই। তিতির মিস্ করলে বলবে, 'যা দুর্যোগ! অন্ধকার! আমিই পারলাম না, তা ও কী করে পারবে।' কী চক্রান্ত!

তাহলে আর মিছিমিছি এসব তা কেন ?

"এবার রুদ্র।" ঋজুদা বলল। "কিন্তু কোন ওয়েপন দিয়ে মারবি ? বিফেনকেওয়ালার নতুন প্রোজেক্ট টু-সেভেন্টিফাইভ রাইফেল দিয়েই মার। তোকে হ্যান্ডিক্যাপ্ দেব—নতুন রাইফেল—প্র্যাকটিস্ করার সুযোগ পাসনি। রাইফেল জিরোয়িং করাও হয়নি। ওকে ? গাট্ গুনলি থ্রী শটস্! মাত্র তিনটি গুলি।"

রাইফেলটা তুলে নিলাম। গুলি ভরলাম ম্যাগাজিনে। কোথাও কোনো আলো নেই। খামারেরও সব আলো নিভোনো। শেডটার নীচে দাঁড়িয়েও মুখে-চোখে জোড়ো হাওয়ায় জলের ঝাপটা লাগছে। টিনগুলো ক্রমাগত দুলছে। প্রথম গুলি, মিস্। দ্বিতীয় গুলি করতেই দনদন্ করে একটা টিন কথা বলল। তৃতীয় গুলি মিস্।

ঋজুদা বলল, "ওয়েল ডান। ভেরি ওয়েল ডান, ইনডিড। এই ওয়েদারে অন্ধকারে।"

তারপর তিতিরকে বলল, "তিতির, তোমার রাইফেলটা দিয়েছে তো গদাধর ?"

"হুঁ।"

আমি বললাম, "কী রাইফেল ?"

"পয়েন্ট টু-টু।" তিতির বলল।

বললাম, "ওঃ। অনেক লাইট-রাইফেল। এ তো খেলনা।"

তিতির সঙ্গে-সঙ্গে কথাটার মানে বুঝল। বুঝেই, ঋজুদার দিকে তাকাল। বলল, "ঋজুকাকা, আমার রাইফেলে মারা অনেক সহজ হবে। রুদ্র যে রাইফেলে মারল, আমিও সেই রাইফেলেই মারব—আমার কাছেও তো এটা নতুন।"

ঋজুদা বলল, "দ্যাটস্ ভেরি স্পোর্টিং অব হার ইনডিড।"

আমি আমার নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হলাম। খুশিও হলাম এই কারণে যে, এই রাইফেল দিয়ে তিতির একটি গুলিও লাগাতে পারবে না। পয়েন্ট টু-টু রাইফেল, ছোটবেলায় আমাদের সাউথ-ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের ক্যাপ্টেন বসু-ঠাকুর থুতনির উপর বসিয়েই বলে-বলে কাক মারতেন।

তিতির রাইফেলটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিল। তারপর তুলে এইম করল। দেখলাম, চমৎকার হোল্ডিং। তারপর, আমি যা করিনি, তাই করল। শট নেবার সময় যেমন ব্যারেল সুইং করে মারতে হয়, তেমনভাবে দু-একবার শ্যাডো সুইং করে নিয়েই পরপর র‍্যাপিড ফায়ার করে তিনটে গুলি করল। কী হল, তা বোঝবার আগেই ঝন ঝনাঝন, ঝন ঝনাঝন, ঝর্ঝনাঝন করে তিনটি টিনই আওয়াজ দিল।

বিষেণদেওবাবু পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠলেন, "শাবাশ, শাবাশ! শাবাশ বেটি!"

আমার গলার কাছে লজ্জা ও অপমান এবং হেরে-যাওয়ার গ্লানি দলা পাকিয়ে উঠল। তবুও মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই র‍্যাপিড-ফায়ারের গুলির মতোই বেরিয়ে গেল: "কনগ্র্যাচুলেশানস!"

তিতির বলল, "রুদ্র, আমি শুনেছি ঋজুকাকার কাছে, তুমি আসলে আমার চেয়ে অনেক ভাল মারো। আমার আনতাবড়ি গুলিগুলো আজ বাই-চান্স লেগে গেছে!"

ঋজুদা আর একটুও সময় নষ্ট না করে, পাছে আমি আর কোনো আপত্তি তুলি, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তাহলে তিতির যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে? কী বলো তিতিরবিবি?"

"আমি তো আর পরীক্ষা দিতে চাইনি। তুমিই এসব করলে, এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ!"

ঋজুদার ফ্ল্যাটে আমরা খেতে বসলাম, বিষেণদেওবাবুর সঙ্গে অনেক গল্প-টল্প করার পর। বিষেণদেওবাবু বললেন, "তোমরা আফ্রিকাতে যাবার আগে তিতির-বেটিকে আমার পয়েন্ট থ্রী-টু কোল্ট পিস্তলটা পাঠিয়ে দেব মুলিমালোঁয়া থেকে। ভানুপ্রতাপই নেই। আমি আর অতগুলো রেখে কী করব। শিকার তো আমি ছেড়েই দিয়েছি কবে। ঋজুবাবু, আপনি শুধু ওর লাইসেন্সের বন্দোবস্তটা করে রাখবেন।"

ঋজুদা বলল, "তিতির অল-ইণ্ডিয়া রাইফেল শুটিং কমপিটিশানে ফার্স্ট হয়েছিল। আর্ল-রবার্টস ক্যাডেট-ট্রফিও ও পেত, জ্বর না হলে। অতএব লাইসেন্স কোনো প্রবলেম নয়।"

তিতির বলল, "আমার ছোট দাদু ওয়েস্ট বেঙ্গলের হোম-সেক্রেটারি।

লাইসেন্স পেতে অসুবিধা হবে না।" বলেই, রান্নাঘরে গিয়ে আমাদের জন্যে এমন নরম আর ফার্স্ট ক্লাস ওমলেট বানিয়ে আনল মাশরুম, চিকেন, কাঁচা পেঁয়াজ, টোমাটো আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে যে, খেয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

বিষেণদেওবাবু বললেন, "স্ট্রিক্ট ভেজিটারিয়ানও ঐ ওমলেট খাবে। ভারী উমদা বানালে বেটি!"

ঋজুদা বলল, "গদাধর, ইমপ্রুভ কর, রান্না শিখে নে; নইলে, তোর চাকরি যাবে!" আমার দিকে চেয়ে বলল, "মিস্টার ডিরেক্টর সাহেব, তাহলে, যে-রাঁধে সেও যে কড়ি-কড়ি চুল বাঁধতে পারে, এ-কথা স্বীকার করছ?"

ফেঁসে গেলাম। ঋজুদার কাজই এই।

মুখে বললাম, "কী বলছ বুঝতে পারছি না!"

বলেই হেসে উঠলাম। হাসতেও যে এত কষ্ট হয়, তা আগে কখনও জানিনি।

॥ ২ ॥

এখন এয়ার-ইণ্ডিয়ার ডাইরেক্ট ফ্লাইট হয়েছে ডার-এস্-সালামে। গতবার যখন এসেছিলাম, তখন সেশেলস অবধি গিয়ে সেশেলস থেকে তানজানিয়ান এয়ার-লাইনসের প্লেনে যেতে হত।

ডার-এস্-সালামে কিলিম্যানজারো হোটেলে ঋজুদার ঘরে বসে আমাদের কথা হচ্ছিল। আমরা তিনজনে তিনটি সিংগল্ রুমে রয়েছি পাশাপাশি। হোটেলের সামনে পার্কিং লট্। সারি সারি বিদেশী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তানজানিয়াতে টুথব্রাশও তৈরি হয় না—তাই, গাড়ি-টাড়ি সবই ইম্পোর্টেড। সামনে রাস্তা। রাস্তার ওপাশে ভারত মহাসাগরের বুক থেকে এক টুকরো খাঁড়ি ঢুকে এসেছে। উত্তরে সমুদ্র বেয়ে কিছুটা এগোলেই মোম্বাসা। পুবে জাঞ্জিবার। সারি সারি জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষ হেঁটে চলেছে। গাড়ি যাওয়া-আসা করছে জোরে, ঝুইক্, ঝুইক্ শব্দ করে। দাঁড়কাক ডাকছে।

আমরা যার যার কিট্ চেক করে নিচ্ছি। তিতির ভাল ফোটোও

রেখেছে। টেলিস্কোপিক লেন্স-লাগানো আনশাট্জ-শেনাউয়ার এম-ই ক্যামেরাটি নিয়ে এসেছে ও। আর এনেছে ওর পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটা। এই রাইফেল দিয়ে ছোট হরিণ, গ্যাজেল, খরগোশ ইত্যাদি মারে লোকে। মানুষ মারার জন্যেও আইডিয়াল। তবে, তিতির কখনও মানুষ মারেনি। আমি আর ঋজুদা তো অলরেডি খুনিই হয়ে গেছি। পাপী খুনি। বিষেণদেওবাবুর প্রেজেন্ট একেবারে ঝকঝকে আমেরিকান কোল্ট পিস্তলটাও নিয়ে এসেছে ও। গোটা ছয়েক এক্সট্রা ম্যাগাজিন। লোড করা থাকলে, পর-পর ঢুকিয়ে দিলেই হল।

আমার পয়েন্ট টু-টু স্প্যানিশ লামা পিস্তলটাও নিয়ে এসেছি। আলবিনোর রহস্য ভেদ করার সময়ে যেটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল ঋজুদা। আর নাগার সেকেণ্ড লাইসেন্সে চড়ানো, থার্টি-ও-সিক্স ম্যানলিকার শুনার। ঋজুদা যে থ্রী-সেভেনটিন পিস্তলটা মুগিমাতোলোয়াতে নিয়ে গেছিল সেটাই এনেছে। সাইলেন্সারটাও। আর ফোর-সেভেন্টি ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা। গণ্ডার, হাতি কি সিংহ, কি লেপার্ড বা চিতা যদি গায়ে পড়ে ঝামেলা বাধাতে আসে, তাদের মোকাবিলার জন্যে। তাছাড়া, আমাদের সঙ্গে আছে জাইসের বাইনাকুলার। তিতিরের সঙ্গে একটা জাপানি বাইনাকুলার। কাটমাণ্ডু থেকে ওর বাবা ওকে এনে দিয়েছিলেন।

এবার আমরা জানি না, কোনদিকে যাব। কতদিন থাকব। কিসে করে যাব। সবই ঠিক হবে আরুশাতে পৌঁছে ভুষুণ্ডার খোঁজ পেলে। তাছাড়া, এবার আমাদের সঙ্গে আছে ছদ্মবেশ নেবার সরঞ্জাম। ডার-এস-সালাম থেকে আরুশার প্লেনে আমরা নিজেদের নামে ট্রাভেল করব না। আরুশার হোটেলেও আলাদা আলাদা নামে ঘর বুক করা হয়েছে। মাসাইদের মতো আমরাও পুরনো নাম ইচ্ছেমতো বদলে ফেলব।

হোটেলের বিল পেমেন্ট করেই, ঋজুদার এক তানজানিয়ান বন্ধুর গাড়ি নিজেরা চালিয়ে সমুদ্রের ধারে নির্জনে, যেদিকে প্রেসিডেন্ট নীয়েরের বাড়ি, সেখানে সী-বীচে ছদ্মবেশ নিয়ে, আলাদা আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে ডার-এস-সালাম এয়ারপোর্টে পৌঁছব। ঋজুদার এই বন্ধুই গতবারে মীরশাম পাইপ প্রেজেন্ট করেছিল ঋজুদাকে।

গতবার ভুষুণ্ডার গুলি খেয়ে আহত হবার পরে ঋজুদা নানা লোকের

সঙ্গে যোগাযোগ করে এ-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হয়েছে যে, ভুষুণ্ডা একটা যন্ত্রমাত্র। পুব-আফ্রিকার জানোয়ারদের মাংস ও চামড়া, হাতির দাঁত এবং গণ্ডারের খড়্গের চোরা-চালানের ব্যবসার পিছনে আছে সব বাঘা-বাঘা লোক। অথচ কেউই জানে না, তারা কারা। তাদের অর্থ, প্রতিপত্তি, সুনাম কিছুরই অভাব নেই।

ঠিক হয়েছে, আমি একজোড়া ফলস্-দাঁত আর লাল পরচুলা পরব এবং কানাডাতে সেটল্-করা একজন অল্পবয়সী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান টুরিস্ট হিসাবে আরুশাতে পৌঁছব। তিতির সাজবে একটি ব্লণ্ড, ফ্রেঞ্চ মেয়ে। প্যারিসের কলেজের ছাত্রী।

তানজানিয়া কম্যুনিস্ট দেশ। এখানে আমেরিকানরা কম আসে। তিতির কাজ চালানোর মতো ফ্রেঞ্চ জানে। ও এই দেশে নতুন যাত্রী। আমিও নতুন। তাই আমরা আরুশা পৌঁছবার পর দিনই আরুশার হোটেলের লাউঞ্জে আমার সঙ্গে তিতিরের আলাপ হবে; হঠাৎই। আমরা বন্ধু হয়ে যাব। ঋজুদা সাজবে একজন দিল্লিওয়ালা বুড়ো সর্দারজি। বয়স্ক, চুল-দাড়ি সাদা, হাতে লাঠি; তানজানিয়াতে এক্সপোর্ট বিজনেস্ করার ধান্দায় এসেছে। আমাদের তিনজনেরই জাল পাসপোর্ট করে নেওয়া হয়েছে। তানজানিয়ান এবং ইণ্ডিয়ান ফরেন ডিপার্টমেন্টের এবং হোম ডিপার্টমেন্টের সম্মতি নিয়ে। আমাদের আসল পাসপোর্ট এখানেই রেখে যাব ঋজুদার ঐ বন্ধু মিঃ লিলেকাওয়ার কাছে। রক্ষাকবচ আছে তিনজনেরই। একটি করে ছোট্ট কার্ড। সে-রকম বিপদ না ঘটলে সেই কার্ড দেখিয়ে এখানে কোনো পুলিশের সাহায্য নেব না বলেই ঠিক করেছি আমরা। কারণ, বড় বড় অপরাধীদের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশ সব দেশেই থাকে। ভুষুণ্ডার ব্যাপারটা আমরা নিজেরাই হ্যাণ্ডল করব।

ঋজুদা বলেছিল, ওর একটা ঠ্যাং ভেঙে দিয়েই ছেড়ে দেবে। আমি বলেছি, টেডির মৃত্যুর বদলা না-নিয়ে আমি ওকে ছাড়ব না। যে-রাইফেল দিয়ে অনেক শুয়োর মেরেছি ছোটবেলা থেকে, তা দিয়েই ভুষুণ্ডা-শুয়োরকে আমি শেষ করব। কোনো ছাড়াছাড়ি নেই দেখা পেলে, তাতে প্রাণ যায় তো যাবে। তিতির আমাদের সাহায্য করবে।

তিতিরকে ভুষুণ্ডার সমস্ত ছবি দেখিয়ে আমরা চিনিয়ে দিয়েছি।

তাছাড়া, ওর ব্যাগেও একটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবি দিয়ে দিয়েছি। ঋজুদার নাম হয়েছে সর্দার গুরিন্দার সিং। অতএব, নিবাসও ডিফেন্স কলোনি, নিউ দিল্লি। আমার নাম জন অ্যালেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ছোটবেলা কেটেছে বিহারের ম্যাকলাস্কিগঞ্জের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলোনিতে। এখন কানাডার টোরোন্টোর ডন-ভ্যালিতে একটি ফ্ল্যাটে থাকি। এঞ্জিন-ড্রাইভারের কাজ করি টিউব রেলে। ছুটিতে টাকা জমিয়ে আফ্রিকা দেখতে এসেছি।

তিতিরের নাম ক্রিস্ অ্যালেবি। প্যারিসেই ওর জন্ম। জুওলজির ছাত্রী। আফ্রিকান হাতি সম্বন্ধে জানতে-শুনতে এবং রিসার্চ করতে এসেছে ও।

তিতির বলল, "রুদ্র, তোমার হঠাৎ ব্যথা লাগলেই তুমি বল উঃ বাবাঃ! কক্ষনো বলবে না, বলবে, আউচ! বুঝেছ! তুমি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান।"

ঋজুদা বলল, "ক্রিস! রুদ্র বলে তুমি যার সঙ্গে কথা বলছ, তার নাম জন অ্যালেন। এখন থেকে যার-যার নতুন নামেই ডাকাডাকি করবে, নইলে মুশকিল হয়ে যাবে। আমাদের কমন ল্যাঙ্গুয়েজ এখন থেকে ইংরিজি। অন্যদের সামনে। বুঝেছ! একবারও ভুল কোরো না। এসো, একবার বরং রিহার্সাল দিয়ে নেওয়া যাক।"

আমি বললাম, "স্টার্ট!"

তিতির বলল, "মিঃ সিং, হাউ বাউট দ্যা আন-এন্ডিং পাওয়ারশেডিং ইন কালকাটা? উ্যা সেইড, উ্যা হ্যাভ অ্যান অফিস ইন কালকাটা। ওয়ান অব মাই ফ্রেন্ডস লিভস দেয়ার। হি অলওয়েজ কমপ্লেইনস বাউট দ্যাট।"

ঋজুদা বলল, "হানজি। উ্যা আর রাইট্ জি। দ্যা কণ্ডিশান ইজ ভেরি টাইট্।"

বলেই বলল, "মাই ইংলিশ ইজ নাট্ গুড।"

তিতির হাততালি দিল।

আমি এবার বললাম, "মিস অ্যালেবি, ডু উ্যা হ্যাভ এনি পাঞ্জাবি ধাবা'জ ইন ইওর কানট্রি?"

তিতির ভুরু কুঁচকে বলল, "পার্দোঁ মঁসিয়ে? নেভার হার্ড অফ সাচ্ থিংগস। হোয়াট ইজ ইট? আ টেম্পল অর সামথিং?"

ঋজুদা বলল, "নান্‌জি। আ ধাবা ইজ আ প্লেস হোয়্যার উই সীট অন চারপাইজ, অ্যাণ্ড রেলিশ্ আওয়ার রোটি—তাড়কা অ্যাণ্ড রাজমা দাল।"

"হোয়াট ইজ টাড়কা-রাজমা-দাল?"

তিতির ভুরু কুঁচকে শুধোল।

"হানজি। হ্যাভনট্ হার্ড অফ? স্ট্রেঞ্জ! থোড়ো জি। কোই গ্যাল্ নেহি। বাট তাড়কা-রাজমা-ডাল গিভস্ উ্যা জোশ্। পিয়ারি জি।"

ঋজুদার কথা শেষ হতে না-হতেই ফোনটা বাজল। মিস্টার শাহ বলে একজনের ফোন। ফোন রেখে ঋজুদা বলল, "আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন গুজরাটি ভদ্রলোক ডিনারে।"

ব্যাপারটা কী তা ভাল করে জানবার আগেই আবার ফোন। এবার লিলেকাওয়া। ঋজুদার বন্ধু।

লিলেকাওয়া বললেন যে, ওঁর সঙ্গে নাকি আগে মিঃ শাহর কথা হয়নি কোনো। ঋজুদাকে ফোন করার পরই উনি লিলেকাওয়াকে ফোন করেছিলেন। তবে ডিনারের অনুরোধ জানালেন লিলেকাওয়াও, মিঃ শাহর হয়ে।

"বন্ধুর বন্ধুকে জোর করে খাওয়ানোর এমন আগ্রহ তো বড় একটা দেখা যায় না।" গম্ভীরমুখে ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, "কী করবে ঋজুকাকা? যাবে?"

"যাব না? কেন? গুজরাটি খাবার আমার খুব ভাল লাগে।" আমি বললাম।

ঋজুদা হাসিমুখে পাইপটাতে তামাক ভরতে ভরতে তিতিরকে বলল, "খাওয়াই যাক। সাধা লক্ষ্মী, পায়ে ঠেলতে নেই। হ্যাঁ। একটা কথা—।"

রাত পৌনে-আটটায় রিসেপশান থেকে ফোন।

লিলেকাওয়া এবং মিস্টার শাহ দুজনেই এসে গেছেন। নীচে নেমে দেখলাম, বেশ মোটাসোটা, বেঁটে একজন গুজরাটি ভদ্রলোক কালো-রঙা থ্রী-পিস-স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে ইয়া মোটা সিগার। চিমনির মতো ধোঁয়া ছাড়ছেন সব সময়। বোঁটকা গন্ধ সিগারটার! ওঁর সাদা-রঙা ঝকঝকে মার্সিডিস্ গাড়িতে আমি আর তিতির উঠলাম। ঋজুদা মিস্টার লিলেকাওয়ার সঙ্গে। মিনিট-কুড়ির মধ্যেই আমরা একটি ফাঁকা কিন্তু খুব

শস্ এলাকায় চলে এলাম। ধরুন ধারুণ সব গাড়ি, বাংলো। আলো-ঝলমলো বিরাট গেট-ওয়ালা ছবির মতো একটা বাংলোতে গাড়ি ঢুকল। টুপি-পরা শোফার দরজা খুলে দিল।

নানা জানোয়ারের ফোটোতে সাজানো বিরাট ফিকে খয়েরি-রঙা কার্পেটে মোড়া ড্রয়িংরুমে আমাদের সকলকে নিয়ে বসালেন মিস্টার শাহ। ঋজুদা ও মিস্টার লিলেকাওয়ার সঙ্গে কথাবার্তায় জানা গেল যে, মিস্টার শাহ কফি প্ল্যান্টেশানের মালিক, তাছাড়া আরও নানান ব্যবসা তাঁর। একজন শখের ফোটোগ্রাফারও উনি। নানা জীবজন্তুর ছবি তোলেন সময় পেলেই। বন-জঙ্গল খুবই নাকি ভালবাসেন। ওঁর ইচ্ছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জঙ্গলে পরপর অনেকগুলি টুরিস্ট লজ এবং মোটেল খুলবেন, এবং পৃথিবীর তাবৎ জায়গা থেকে আসা টুরিস্টদের একাংশকে ভারতেও পাঠাবেন। একটি কোম্পানি গড়বেন তিনি, নাম দেবেন "জাঙ্গল্ মোটেলস্ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড।" তিনি ঋজুদাকে সেই কোম্পানির ডিরেক্টর করতে চান বলেই নাকি আজকের এই হঠাৎ নেমন্তন্ন।

মিস্টার শাহ আর ঋজুদারা কোম্পানি এবং আয়কর আইনের নানা কচকচি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সে-সবের একবর্ণও আমি আর তিতির বুঝি না এবং বোঝবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও ছিল না আমাদের। তিতির আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে মিস্টার লিলেকাওয়াকে বললাম, "এক্সকিউজ মী আঙ্কল্, মে উই টেক ইওর কার ফর হাফ-এন আওয়ার?"

ঋজুদা আমার চোখে তাকাল। ইংরিজিতে বলল, "কোথায় যাবি তোরা?"

"এমনিই একটু ঘুরে আসতাম। তোমাদের কথার তো কিছুই বুঝছি না।"

মিস্টার লিলেকাওয়া বললেন, "বাই অল্ মীনস্", বলে চাবিটা দিলেন আমাকে।

মিস্টার শাহ্ বললেন, "উগান্ডার সঙ্গে যুদ্ধের পর প্রচুর আর্মস এসে গেছে তানজানিয়াতে। খুব ছিনতাই ডাকাতি হচ্ছে চারধারে, তোমরা ছেলেমানুষ, রাতে একা একা যেও না।"

আমি কিছু বলার আগেই তিতির বলল, "উই ক্যান টেক কেয়ার অফ আওয়ারসেলভস্। থ্যাঙ্ক উ্য।"

মিঃ শাহ আমাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হেসে বললেন, "তবে যাও, সাবধানে যেও।"

লিলেকাওয়া এখানে ইউ-এন-ও'র চাকরি করেন। তাঁর লাল-রঙা টোয়োটা গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে বসে তিতিরকে পাশের দরজা খুলে দিলাম। তিতির উঠে বসে বলল, "কোথায় যাবে?"

বললাম, "লক্ষ করেছিলে? ড্রইংরুমের দেওয়ালে একটা ছবি আছে, ক্যাম্পফায়ারের সামনে চেয়ারে বসে মিঃ শাহ সিগার টানছেন। পিছনে কতগুলো খড়ের ঘর। ঐ জায়গাটা আমার ভীষণই চেনা-চেনা লাগল। ভী—ষণ।"

"কোন জায়গা সেটা?"

"ঠিক কিনা জানি না, তবে মনে হচ্ছে গুগুনোগুম্বারের দেশে ডুসুণ্ডা সোডা লেকের পাশে যেখানে আমাদের নিয়ে গেছিল, যেখানে টেড়িকে বিষের তীর দিয়ে মেরেছিল সেই জায়গা ওটা। ওয়াণ্ডারোবোদের সেই ডেরা।"

"বল কী?" তিতির রীতিমত এক্সাইটেড হয়ে বলল। "তুমি শিওর?"

"মনে হচ্ছে। ভুলও হতে পারে।"

"বাবাঃ। শুনেই আমার ভয়-ভয় করছে।" তিতির বলল।

"আমারও। সব পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।"

"এখন কোথায় যাবে? মতলবটা কী তোমার?"

"কোথাও না। গাড়িটাকে ঐ সামনের গাছগুলোর নীচে পার্ক করে রেখে, মিঃ শাহর বাংলোর চারপাশে ঘুরে দেখব। টর্চ আছে তোমার সঙ্গে?"

"হুঁ। তবে, চাঁদও আছে।" তিতির বলল।

"তা আছে।"

যখন পথের পাশের বড় বড় গাছগুলোর ছায়ার অন্ধকারে গাড়িটাকে রেখে, লক্ করে নামলাম, তখন গাড়ির লাল রঙ রাতের অন্ধকারে কালো

মনে হওয়ায় ওখানে যে গাড়ি আছে তা বোঝা যাচ্ছিল না। আমরা সাবধানে হেঁটে বাংলোটার পিছনে এলাম। পথে লোকজন নেই। বড়লোকেদের পাড়া। অনেকক্ষণ বাদে বাদে দু-একটি গাড়ি হুস্-হাস্ শব্দ করে হেডলাইট জ্বেলে চলে যাচ্ছে। বাংলোর পিছনের বাউণ্ডারি-ওয়ালের গায়ে কতগুলো আফ্রিকান টিউলিপের গাছ, আমরা দেশে যাকে আকাশমণি বলি। সেই গাছগুলোর ছায়ায় ছোট্ট একটা গেট। তালাবন্ধ, ভিতর থেকে। তিতিরকে ইশারা করে আমি গেটের লোহা বেয়ে উপরে উঠে নামলাম। তিতিরও গেট ডিঙোল আমার পেছন পেছন।

বিরাট লন। নানারকম ফুল ও ফলের গাছ। জাঞ্জিবারের দারচিনি লবঙ্গ থেকে গোরোংগোরোর মধ্য আগ্নেয়গিরির পাশের উঁচু পাহাড়ের আর্কিড পর্যন্ত। বাংলোটার পেছনদিকে লাগোয়া বাবুর্চিখানা, প্যান্ট্রি, সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টার্স। আলো জ্বলছে। রান্নাঘরের উপরের মেটে-লালরঙা ফায়ারব্রিকে তৈরি চারকোনা চিমনি থেকে মিশকালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে দুধসাদা চাঁদনি রাতে। বাংলোটার বাঁ পাশে একটা আলাদা বাড়ি অথবা গুদাম। সেখানটা বেশ অন্ধকার, গাছপালার ঘন ছায়ায়। চাঁদের আলো পড়ে ছাই-রঙা গুদামটাকে কেমন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। আমি ও তিতির পায়ে পায়ে ওদিকে গিয়ে পৌঁছতেই কোত্থেকে একটা কুকুর গুর-র-র-র করে উঠল। আমার পেটের মধ্যেও গুর-র-র-র করে উঠল। তাকিয়ে দেখলাম একটা কালো লাব্রাডর গান্-ডগ আমাদের দেখছে লেজ উঁচিয়ে কান খাড়া করে। তার হাবভাব মোটেই ভাল নয়। তিতির বোধহয় ওর রুমালটা পাকিয়ে কুকুরটার মুখে পুরে দেবার মতলব করছিল, এমন সময় কুকুরটা আরও একবার ডাকল। সংক্ষিপ্ত চাপা ডাক। সঙ্গে সঙ্গেই বাংলোর বিভিন্ন দিকের দেওয়ালে ফিট-করা অনেকগুলো সার্চ লাইট জ্বলে উঠল একসঙ্গে।

অলিভ-গ্রীন কর্ডুরয়ের ট্রাউজার ও কোট পরা প্রায় সাত ফিট লম্বা একজন ঘণ্টামার্কা নিগ্রো যেন মাটি ফুঁড়েই উঠে আমাদের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে খসখসে গলায় ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে বলল, "জাম্বো।"

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বললাম, "হু-জাম্বো।"

লোকটা এগিয়ে এসে বলল, "ওহে, ডিক্ ডিক্-এর বাচ্চারা। তোমরা কারা? এখানে কোন্ মহৎ কর্ম্মে করতে আসা?"

আমি গম্ভীর গলায় তার মুখের দিকে মুখ তুলে বললাম, "আমরা মিঃ শাহর অতিথি। ডিনারে এসেছি। বাগান দেখছিলাম।"

"তাইই? তবে অতিথিরা গেট টপকে ঢুকে সচরাচর হোস্টের বাগান-টাগান দেখেন না। এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল? মিঃ শাহকে বললেই তো হত।" বলেই, পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই ঐ রহস্যময় অন্ধকার বাড়িটার দিক থেকে সরিয়ে আনল। তারপর আমাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে খুব ঠাণ্ডা ঠাট্টার গলায় বলল, "তোমরা খুব অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসো, তাই না? জোড়া ডিক্-ডিক্।"

"হ্যাঁ।" তিতির বলল।

"আমিও। খুব ভালবাসি অ্যাডভেঞ্চার।" বলেই, লোকটা আমাদের দুজনের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ একবার হাততালি দিল। সবকটা সার্চলাইটের আলো একসঙ্গে নিভে গেল।

তিতির বলল, "তোমার নাম কী?"

লোকটা হাসল, অদ্ভুতভাবে। সোনা-বাঁধানো তিন-চারটে দাঁত চাঁদের আলোতেও ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। বলল, "আমার নাম ওয়ানাবেরি। চলো, তোমরা যেখানে গাড়ি রেখেছ, সেখানেই যাই। আজ বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। গাড়িতে বসেই তোমাদের একটা গল্প বলব।"

"গল্প? কিসের গল্প?" তিতির ভয়-মেশানো কৌতূহলের সঙ্গে শুধোল।

"ওয়ানাকিরি, ওয়ানাবেরির গল্প।"

গা ছমছম্ করে উঠল। তিতির ওর বাঁ হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি ওর হাতটা হাতে নিয়ে দেখলাম একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হাতটা।

ছোট গেটটার কাছে পৌঁছতেই লোকটা পকেট থেকে চাবি দিয়ে গেটের তালা খুলল। তারপর কথা না-বলে গেট থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোতে লাগল।

তিতির বাংলোয় বলল, "আমরা কোথায় গাড়ি রেখেছি তা পর্যন্ত ও

লেগেছে। সবই লেগেছে।"

"হুঁ।" বলে, আমি কোমরের কাছে হাত দিয়ে, যেন হঠাৎই হাত লেগে গেছে এমন করে পিস্তলটার হোলস্টারের বোতাম খুললাম।

লোকটা যেন নিজের মনেই হেসে উঠল। বলল, "ওয়ানাবেরিকে মারা যায় না। ওয়ানাবেরি কখনও মরে না, জানো?"

"জানি।" তিতির বলল।

"জানো?" বলেই লোকটা তিতিরের দিকে বিচ্ছিরি চোখে তাকাল।

অবাক চোখে তিতিরের দিকে তাকালাম আমি।

তিতির বলল, "তুমি এই বাংলোতেই থাকো?"

"হ্যাঁ। মিস্টার শাহ আমার মালিক।"

"তুমি কী কাজ করো?"

"অকাজ।"

"মানে?"

"মানে নেই। সব কথার মানে হয় না।"

গাড়ির কাছে পৌঁছে, গাড়ি খুলে ওকে সামনের সীটে বসতে বলে তিতিরকে পিছনে বসতে বললাম। কেন বললাম, তিতির নিশ্চয়ই বুঝল। প্রয়োজন হলে, ওর ঘাড়ে পিছন থেকে পিস্তলের নল ঠেকাবে।

লোকটা একটা সিগারেট ধরাল পকেট থেকে প্যাকেট বের করে। সিগারেটটার গন্ধটা বিচ্ছিরি। তারপর জানালার কাঁচ নামিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে, জানালাটা খুলেই রাখল।

গাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাতে বেশ ঠান্ডা লাগতে লাগল আমাদের। অথচ, লোকটার ভ্রূক্ষেপ নেই। চাঁদের আলো গাছগুলোর ফাঁক-ফোঁক দিয়ে এসে পড়ে আলোছায়ার কার্পেট বুনেছিল গাড়ির বনেটের উপরে। চারপাশে। লোকটা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে, নিজের মনেই, যেন নিজেকে শোনাবার জন্যেই, নিচু স্বরে বলতে আরম্ভ করল।

"অনেক, অ—নেক দিন আগে মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছিল আফ্রিকার বনে জঙ্গলে। কোন মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সেই খোঁজে। আর মানুষদের লোক দেখানোর জন্যে তার পিছনে পিছনে একটা খুব মোটা চর্বি-নাদুসনুদুস ষাঁড়কে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার গলায় দড়ি বেঁধে।

"মৃত্যুর শুধু একজনই মাত্র জিনিস চাইবার ছিল। তা হচ্ছে, জীবন। যে ঐ ষাঁড়টিকে নেবে, এক বছর পরেও ওয়ানাবেরির নামটা তাকে মনে রাখতে হবে। একবছর পরেও যদি সে ওয়ানাবেরির নাম মনে না রাখতে পারে, তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু নিয়ে যাবে ছিনিয়ে।

"একটা লোক ছিল। ভারী গরিব, খাওয়া জুটত না তার। নাম ছিল তার মাকড়শা। খিদের জ্বালায় মাকড়শা ঐ ষাঁড়টাকেই ওয়ানাবেরির কাছ থেকে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে কেটেকুটে কদিন ধরে সবাই মিলে খুব-ভোজ করে খেয়ে তার বউ-ছেলেকে বলল, শোনো। তোমরা আজ থেকে এই গানটি সবসময় গাইবে—ওয়ানাকিরি ওয়ানাবেরি। ওয়ানাকিরি—ওয়ানাবেরি। সবসময়, যাতে কখনও—"

হঠাৎ তিতির লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "গাড়ি স্টার্ট করো রুদ্র। চলো বাংলোতে ফিরি। এ-সব গাঁজাখোরি গল্প শোনার সময় নেই।"

গাড়ি স্টার্ট করতেই ওয়ানাবেরি চমকে উঠল। বিরক্ত হয়ে তাকাল আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে। দুর্বোধ্য ভাষায় বলে উঠল, "আমি আমি ওবেগা?"

হঠাৎ তিতির উত্তরে বলে উঠল, "আমবোনা উনাসেমাসেমা দু?"

ওয়ানাবেরি চমকে গিয়ে বলল, "সোসেমি।"

তিতির খুব মিষ্টি গলায় বলল, "টোয়েঙ্গিনী।"

ওয়ানাবেরি স্টীয়ারিং-ধরা আমার হাতে হাত রেখে বলল, "কাওয়া হেরিনি।"

আমি তাকিয়ে রইলাম তার মুখে।

সেই কিম্ভূতকিমাকার হাওয়া-খাওয়া ভাষার কিছুই না-বোঝার বোকার মতো আমি তাকিয়ে রইলাম তার মুখে। তিতির বলল, "রুদ্র, ও [illegible] করে নেমে যেতে চাইছে। ওকে নামিয়ে দাও।"

আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাঁ দিকের দরজা খুলে দিলাম।

ওয়ানাবেরি তখনও অবাক চোখে তিতিরের দিকে তাকিয়েছিল। অবাক আমিও কম হইনি।

লোকটা নেমে, দরজাটা বন্ধ করতে করতে আবার বলল, "হেরিনি।"

"হেরিনি।" তিতির বলল।

ওয়ানাবেরি এবার ভাঙা ইংরিজিতে আমাদের দুজনকেই বলল, "রিমেমবার ওয়ানাবেরি। ওয়ানাকিরি—ওয়ানাবেরি। ওয়ানাকিরি—ওয়ানাবেরি। ডোন্ট ট্রাই টু ফলো মাই নেম। বিকজ, আই উইল কাম ব্যাক—"

আমার গা শিউরে উঠল। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে মিঃ শাহর বাংলোর সামনের গেটের দিকে চললাম।

তিতির বলল, "দেখতে তো কম, ওয়েস্ট-ইন্ডিজের ক্রিকেটার হল-এর চেয়েও লম্বা লোকটা। কথা বলছিল না, যেন বাউন্সার দিচ্ছিল।"

"তুমি তো দেখছি, সোয়াহিলিতে রীতিমত পণ্ডিত তিতির। কী কথা বললে ওর সঙ্গে?"

"নানি আনি ওনেশার মানে হচ্ছে, কে কথা বলছে? আর আমবেনা উনাসেমাসেমা? মানে হচ্ছে, মিছিমিছি বকবক করছ কেন?"

"আর পোলেনি মানে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"পোলেনি মানে, সরি। আর টোয়েন্ডিনী মানে হচ্ছে, চলো, আমরা এবার যাই।"

"বাঃ! সত্যিই তুমি এবার আমাদের সঙ্গে থাকায় অনেক সুবিধা হবে।"

"অসুবিধাও কম হবে না। আমি যে মেয়ে!" তিতির আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে, চুল ঝাঁকিয়ে বলল।

আমি জানি, কিছুদিন ও আমাকে এমনি করেই ঠাট্টা করবে, যতদিন না আমিও প্রমাণ করতে পারছি যে, শহরের মধ্যে ক্যাওয়া-খাওয়া করে গরমের দুপুরে তেষ্টা পাওয়া মুরগির মতো মুখ হাঁ করে দু কলি সোয়াহিলি বলাতে আর জঙ্গলের মারাত্মক পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে অনেক তফাত। তিতির যে মেয়েই, তা ও শিগগিরই বুঝতে পারবে। গর্ব যাবে ওর।

আমরা যখন বাংলোয় ঢুকলাম, আমাদের কেউই লক্ষ করল না। ঋজুদারা তিনজনে এমনই আলোচনাতে ব্যস্ত।

তিতির হঠাৎ বলল, "এজন্যই বলে, মেয়েরা হল গিয়ে বাড়ির লক্ষ্মী। বাংলোটা কেমন লক্ষ্মীছাড়া-লক্ষ্মীছাড়া দেখতে পাচ্ছ রুদ্র? সবই আছে,

কিন্তু কী যেন নেই। মিঃ শাহ ব্যাচেলর কি না?"

"হুঁ।" আমি বললাম।

ভাবলাম মেয়েটা মায়েদের মতোই পাকা-পাকা কথা বলে। মেয়েরা ঐ রকমই হয়। ছোটবেলা থেকেই। ঋজুদা যে কেন এসব ঝুট-ঝামেলা সঙ্গে আনল। আমার নজর ছিল কিন্তু দেওয়ালের সেই ফোটোটার উপর। আরও অনেক ফোটো ছিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর খাবার এল। গরম গরম পুরি, ভাজি, আচার নানারকমের, কাড়াই। দারুণ। কিন্তু খাবার আগেই গ্লাস-গ্লাস জিরাপানি খেয়েই পেট ফুলে গেছিল আমাদের। ঋজুদা খাবার সময় কেমন অন্যমনস্ক ছিল। বলল, "লিলেকাওয়া, আমরা তাড়াতাড়িই যাব একটু। কাল ভোরেই তো চলে যাচ্ছি মোম্বাসা।"

মিঃ শাহ বললেন, "মোম্বাসা? হোয়াই মোম্বাসা?" বলেই বললেন, "ওহ, ইয়েস, মোম্বাসা! মোম্বাসা!"

হোটেলে লিলেকাওয়া আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেলেন। আশ্চর্য হলাম, ঋজুদা কাল ওঁকে গাড়ির বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে কিছুই না-বলায়। ওঁকে গুডনাইট করে হোটেলের লবিতে ঢুকে ঋজুদা বলল, "আমরা ট্যাক্সি নিয়েই চলে যাব, বুঝলি?"

ঋজুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রহস্যের গন্ধ পেয়ে কিছু না বুঝেই বললাম, "বুঝলাম।"

প্রথমে ঋজুদার ঘরেই ঢুকলাম আমরা সবাই। ঘরে ঢুকেই ঋজুদা নাক টেনে বলল, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ, নতুন গন্ধ পাঁউ।"

আমি বললাম, "সিগারেটের গন্ধ। তানজানিয়ান সিগারেটের।"

তিতির বলল, "রাইট্। তার মানে, ঘরে কেউ ঢুকেছিল।"

"নাও হতে পারে। হয়তো ভুল আমাদের।" ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, "আমার ঘরে গেলেই বোঝা যাবে।"

"কী করে?"

"ঘর থেকে বেরুবার আগে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাল করে গায়ে-মাখা কিউটিকুরা পাউডার ছড়িয়ে এসেছিলাম।"

আমি তো শুনে অবাক। ঋজুদা কথা না বলে আমার দিকে তাকাল।

তিতির তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলল, আমিও ওর পিছন পিছন। দরজা খুলতেই দেখা গেল পাউডার ছড়ানো আছে এবং কারোই পায়ের দাগ নেই। কিন্তু ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলেই তিতির বলল, "কোনো লোক ঢুকেছিল। কারণ যা। পাউডারের টিনটা দরজা থেকে ঢুকে দিই যখন কার্পেটে, তখন মুখটা ছিল জানালার দিকে, আর এখন আছে দরজার দিকে। তাছাড়া সেখানে ছিল, সেখান থেকে অনেকটা বাঁ দিকে সরে আছে এখন।"

ঘরে ঢুকেই আমি চমকে উঠলাম। তিতিরের ঘরের কাঠের টেবিলটার উপর ওয়াণ্ডারোবোদের জোড়া তীর দিয়ে গাঁথা একটা ছোট্ট চিঠি। বিচ্ছিরি হাতের লেখায় লাল কালি দিয়ে লেখা। "গো হোম ডা প্রেটি গার্ল। অর বী লেফ্ট্ ইন দা উইলডারনেস অব আফ্রিকা।"

আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। তিতিরের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওরও মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এমন সময় ঋজুদা এসে ঘরে ঢুকল। আমাদের দিকে তাকিয়েই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে চিঠিটা পড়ল। তারপর বলল, "কী করবি তিতির? কাল বোম্বে চলে যাবি?"

তিতির খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, "মাথা খারাপ তোমার ঋজুকাকা! ইফ আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভস, আ সেৎসী ফ্লাই হ্যাজ টেন লাইভস - দেন তিতির হ্যাজ ইলেভেন লাইভস্। চলে যাবার জন্যেই যেন এসেছি! খুব বললে ত তুমি! সবে খেলা জমে উঠছে আর এখনই যেতে বলছ!" বলেই, ঋজুদার দিকে চেয়েই সোয়াহিলিতে বলল, "আলিনিপিগা কেকি না উসো?"

ঋজুদাও খুব জোরে হেসে উঠল। বলল, "আশান্টে! আশান্টে!"

আশান্টে মানে, থ্যাঙ্ক ইউ, আমি বুঝলাম। কিন্তু তিতির কী যে বলল, তার কিছুই বুঝলাম না। মেয়েটা বড়ই মুশকিলে ফেলছে আমাকে থেকে-থেকেই।

ঋজুদা আমার অবস্থা বুঝে নিয়ে বলল, "কেমন বুঝছ, রুদ্রবাবু? কিছুই বুঝছ না তো? কথাটির মানে হল, লোকটা আমার গালে চড় কষিয়েছে। তিতির চড় খেয়েও যা ছাড়বে না এমন পাত্রী মোটেই নয় সে; সুতরাং-ঠিকই আছে। লেট আস বার্ন ওল্ দা ব্রিজেস বিহাইণ্ড। পিছনে

ফেরার কথা আর নয়।"

বললাম, "তিতির, তুমি এত ভাল সোয়াহিলি শিখলে কী করে?"

তিতির উত্তর না দিয়ে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

ঋজুদা প্রশংসার চোখে তিতিরের দিকে তাকিয়ে রইল। আর আমি ঈর্ষা, লজ্জা এবং দুঃখের চোখে। সব দিক দিয়েই একটা মেয়ের কাছে হেরে যাচ্ছি। ছিঃ ছিঃ।

ঋজুদা আমাদের গুডনাইট করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলে চলে গেল। মুখ দেখে মনে হল, এখন অনেক চিন্তা-ভাবনা করবে। কালকে মোম্বাসা যাব না বলেই আমার বিশ্বাস। মিঃ শাহকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যেই ঋজুদা ও-কথা বলেছিল। তবে, যেখানেই যাই না কেন, কাল আমরা ডার-এস্-সালাম এয়ারপোর্ট থেকে কোথাও একটা যাবই। এবং শহরের আশ্রয় ছেড়ে জঙ্গলে, যেখানে ভুষুণ্ডা এবং ভুষুণ্ডার মালিকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আমাদের, এমনই কোনো জায়গায়। কী প্ল্যান করেছে, তা ঋজুদাই জানে। সময় হলেই জানাবে।

তিতির বলল, "গুড নাইট অ্যাণ্ড স্লিপ টাইট।"

বললাম, "পিস্তল থাকবে বালিশের নীচে। মনে রেখো।"

"ঠিক হ্যায়।" বলে, তিতির ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

॥ ৩ ॥

সকাল আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে ঋজুদার ঘরে এলাম আমি আর তিতির। ছদ্মবেশের জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে রেখেছি। বাথরুমের আয়নাতে দাঁতটা লাগিয়ে দেখেও নিয়েছি একবার। দারুণ দেখাচ্ছিল। প্রায় দানুয়া-ভুনুয়ার জঙ্গলের দাঁতাল শুয়োরের মতো। মা তাঁর সাধের ছেলেকে তখন দেখলে নির্ঘাত অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

রুম-সার্ভিসকে বলে, ঘরেই ঋজুদার জন্যে কফি আর আমাদের জন্যে দুধ আনিয়ে নেওয়া হল। কফির পেয়ালায় সুগার-কিউব ফেলে চামচ নেড়ে মেশাতে মেশাতে হাসতে হাসতে ঋজুদা বলল, "ব্রেকফাস্ট আর খায় না! যা ঝামেলা বাধালি তোরা আফ্রিকার মাটিতে পা দিতে না-দিতেই। কী দরকার ছিল ওয়ানাবেরির সঙ্গে টক্কর মারতে যাওয়ার?"

বললাম, "আমরা কি টক্কর মারতে গেছি নাকি ? সে-ই তো টরে-টক্কা করে টক্কর বাধাল ।"

আমাদের কাছ থেকে কালকের অভিজ্ঞতা এবং মিঃ শাহর বসবার ঘরের দেওয়ালের ফোটোর কথাও ঋজুদা শুনেছিল । ফোটোর কথা শুনেই ঋজুদা হেসেছিল । মাঝে-মাঝে বেশি-বেশি নিজের মতো ভাব দেখায় ঋজুদা । ভুষুণ্ডার গুলি খাওয়ার পর থেকে একটু বোকা-বোকাও হয়ে গেছে যেন । নয়তো, আমি আগের থেকে চালাক হয়েছি ।

কফিটা খেয়েই ঋজুদা এয়ার তানজানিয়ার অফিসে ফোন করতে বলল আমাকে । করলাম । আরুশার তিনটে টিকিট পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বললেন পাওয়া যাবে । কিন্তু কালকের ফ্লাইটের কোনো টিকিট নেই । পরশুর আছে ।

ঋজুদা বলল, "বলে দে, আমরা এক ঘন্টার মধ্যে টিকিট নিয়ে নেব ।"

তাই-ই বলে দিলাম ।

"পনেরো মিনিট সময় দিলাম । যার যার ভেক ধরো নিজেরা ।" তারপরই বলল, "নাঃ ! সঙ্গেই নিয়ে চল ব্যাগে । অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা । ঘরের চাবি সঙ্গে নিয়ে বেরুবি—রিসেপশানে জমা দেওয়ার দরকার নেই ।"

নীচে নেমে, হোটেলের লবি থেকে চিরুনি কিনল ঋজুদা একটা । দাম কুড়ি টাকা মাত্র । আমি ভেবেছিলাম হাতির দাঁতের হবে বুঝি । হাত দিয়ে দেখি, কেলে প্লাস্টিক ।

ঋজুদা বলল, "এমনিতে কি আর এশিয়ানদের উপর এত রাগ আফ্রিকানদের ? ভারত থেকে দু টাকার চিরুনি এনে এখানে কুড়ি টাকায় বিক্রি করলে ওরা যদি এশিয়ানদের অদূর-ভবিষ্যতে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকায় তাতে আর দোষ কী ? বল ?"

ট্যাক্সি নিয়ে ডাউনটাউনে এসে বেশ বড় একটা জমজমাট রেস্তোরাঁর সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম । এয়ার-কন্ডিশানড, স্বল্পালোকিত রেস্তোরাঁ । কিন্তু ভিড় গিস্‌গিস্‌ । তারই মধ্যে একটি অন্ধকার কোনায় আমরা গিয়ে বসলাম । কফি, তার সঙ্গে সসেজ উইথ বেকন অর্ডার করল ঋজুদা নিজের জন্যে । তিতির চিকেন ওমলেট আর ড্রিঙ্কিং

চকোলেট । আমি মাটন হ্যামবার্গার আর চা । সাতসকালে বড় এক গ্লাস দুধ খেয়ে গা গোলাচ্ছিল । দুধ আবার বড়রা খায় নাকি ? সমস্ত প্রাণিজগতে দুধ খায় শুধু দুগ্ধপোষ্যরাই । যেহেতু দুধের-শিশু তিতির সকালে দুধ খায় সুতরাং আমাকেও দুধ গেলাল ঋজুদা । এ-খবর যদি পৌঁছে ফিরি কলকাতায়, তাহলে ভটকাই নিশ্চয়ই আওয়াজ দেবে আমাকে । তিতিরের বদলে ভটকাইটা এলে কত মজা হত । কিন্তু কে বোঝে এসব কথা ।

কাতলা মাছের হাঁ-করা মুখের মতো একটা মীরশম পাইপে জম্পেশ করে তামাক ঠেসে, কালো লেদার-ফোমের চেয়ারে গা এলিয়ে বসল ঋজুদা । তার পর ধোঁয়া ছাড়তে লাগল চাঁদপাল ঘাটের লক্কড়ে মোটর-লঞ্চের মতো । বুঝলাম, এখন বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া চলবে । কতক্ষণ চলবে, তা ঋজুদাই জানে ।

খাবার এসে গেলেই সোজা হয়ে বসে বলল, "রুদ্র, তুই যেমন পোশাকে আছিস এই পোশাকেই চলে যাবি এয়ার তানজানিয়ার অফিসে । একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিস্‌ । জাঞ্জিবারের টিকিট কাটবি তিনটে । পরশুদিনের ।"

"জাঞ্জিবার ? সে তো অন্য দেশ ।" আমি বললাম ।

তিতির বলল, "তা কেন হবে ? জাঞ্জিবার তো তানজানিয়ারই অংশ । মরিশাস দ্বীপপুঞ্জ আলাদা দেশ । দু জায়গাতেই মসলা হয় বলেই কি মসলা মেশাবে নাকি ?"

বড় ট্যাক-ট্যাক করে মেয়েটা । ভারী তো একটা সাবজেক্ট । ভূগোল । পড়াশুনায় ভাল বলে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে সবসময় । ভুষুণ্ডা আর ওয়ানাবেরির পাল্লায় পড়লে ভূগোল-জ্ঞান বেরিয়ে যাবে । ট্যাকট্যাকানি বন্ধ হবে তখন ।

ঋজুদা বলল, "তিতির, তুমি খেয়ে নিয়েই রেস্তোরাঁর লেডিজ-রুমে গিয়ে মেক-আপ নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে যাবে এয়ার তানজানিয়ার অফিসে । পরশুর টিকিট কাটবে তুমিও । তিনটে । তবে জাঞ্জিবারের নয়, আরুশার । একটাই ফ্লাইট আছে, সকালের দিকে । বোধহয় দশটা কি এগারোটা নাগাদ । রিপোর্টিং টাইমটাও জেনে আসবে ।" বলেই বলল,

"কী কী নামে কাটলে ?"

ততক্ষণে খাবার এসে গেছিল। বেয়ারাকে অগ্রিম মোটা টিপস দিয়ে দিল ঋজুদা। সে বুঝল আমরা অনেকক্ষণ থাকব এখানে। সে চলে যেতেই তিতির বলল, "সর্দার গুরিন্দর সিং, জন অ্যালেন এবং ক্রিস ভ্যালেরি !"

"রাইট !" ঋজুদা বলল, একটা গাব্দা-গোব্দা সসেজকে কাঁটা দিয়ে ধরে, ছুরি দিয়ে কেটে, মাস্টার্ড মাখাতে মাখাতে। তারপর সসেজের টুকরোটি মুখে পুরে দিয়েই বলল, "দুজনেই, টিকিট কেটে আলাদা-আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসবি। রেস্তোরাঁ থেকে বেশ খানিকটা দূরেই ছেড়ে দিবি ট্যাক্সি। তিতির ট্যাক্সি থেকে নেমে নিউজ-স্ট্যাণ্ড থেকে খবরের কাগজ কিনে রেস্তোরাঁতে ঢোকার সময় খবরের কাগজটা মুখের কাছে যথাসম্ভব তুলে ধরে, মুখ আড়াল করে লেডিজ-রুমে গিয়েই মেক-আপ ছেড়ে টেবিলে ফিরে আসবে। ওকে ?"

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বললাম, "ওকে !"

ট্রাভেলার্স চেকের বইটা পকেটে আছে কি নেই ভাল করে দেখে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। তিতির জানে না, কিন্তু আমি জানি যে, এখন একা-একা ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকবে ঋজুদা। একেবারে অন্য জগতে পৌঁছে যাবে। এই ঋজুদাকে আমারই ভয় করে, আর তিতির তো নতুন চিড়িয়া। বেচারি তিতির ! কেন যে এখানে এল ! কাল রাতের তীর-গাঁথা চিঠিটির কথা মনে পড়ে গেল আমার : 'গো হোম, ঊ প্রেটি গার্ল, অর বী বেরিড ইন দি উইলডারনেস্ অব আফ্রিকা'।

মিনিট-কুড়ির মধ্যে ফিরে এলাম টিকিট নিয়ে। আমি ফেরার মিনিট-পনেরোর মধ্যেই তিতিরও ফিরল, লেডিজ-রুম হয়ে। ঠিক সেই সময়ই একটি ঘটনা ঘটল। কে যেন হঠাৎই ছবি তুললেন আমাদের। ফ্ল্যাশলাইটে।

ঋজুদার চোয়াল মুহূর্তের জন্যে শক্ত হয়ে এল। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটি দারুণ নিঃশঙ্ক হাসি ছড়িয়ে গেল ঋজুদার মুখে। পোলারয়েড ক্যামেরা। ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্টটি বেরিয়ে এসেছিল ক্যামেরা থেকে। বেঁটেখাটো মিশকালো ফোটোগ্রাফার পাখার বাতাস করার মতো

দু-তিনবার সেটাকে নাড়তে-চাড়তেই ছবিটা ফুটে উঠল। ফোটোগ্রাফার ছবিটি আমাদের টেবিলে রেখেই আর-একটি ছবি তুললেন।

ঋজুদা এবার শব্দ করে হাসল। বলল, "আশান্টে!"

বলেই তানজানিয়ান শিলিং-এর একটি বড় নোট বের করল তাঁর জন্যে, মোটা পার্স থেকে।

ফোটোগ্রাফার টাকা নিলেন না। বললেন, "আমি পয়সা নিই না। বিদেশী ট্যুরিস্টদের ছবি তুলি এমনিই। এক কপি তাঁদের দিয়ে দিই আর অন্য কপি ট্যুরিজম্ ডিপার্টমেন্টে ও পিকচার পোস্টকার্ড কোম্পানিদের কাছে বিক্রি করি।"

"তবু", ঋজুদা বলল, "আমার নববিবাহিতা স্ত্রী এবং একমাত্র শ্যালকের ছবি তুলে দিলেন। বকশিশ আপনাকে নিতেই হবে।"

ঋজুদার কথা শুনে তিতিরের মুখ এবং আমার দুই কান লাল হয়ে উঠল।

ভদ্রলোক টাকা যখন কিছুতেই নিলেন না, তখন ফোটোর কপিটা চেয়ে নিল দেখবার জন্যে। নিয়েই ফোটোটির পিছনে বল পয়েন্ট পেন দিয়ে বড় বড় করে লিখল "টু ভুসুগু, উইথ্ লাভ। ফ্রম ঋজু, রুদ্র অ্যাণ্ড তিতির"।

লেখাটি পড়তে পড়তে ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোকের গ্রামাফোনের রেকর্ডের মতো কালো মুখটি কালোতর হয়ে গেল। অবাক হয়ে, আমতা-আমতা করে তিনি বললেন, "ভুসুগু? সে কে? আমি তো চিনি না—"

ঋজুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "চেনেন না? আপনি তাকে না চিনলেও, সে হয়তো আপনাকে চেনে। অথবা, চিনে নেবে। যাই হোক, তার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, বাই-চান্স, তবে বলবেন যে, শুধুমাত্র তার সঙ্গে দেখা করতেই আমাদের এতদূর আসা।"

ফোটোগ্রাফারের ভ্যাবাচাকা-খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি পেল আমার।

উনি আমাদের সামনে ভক্তিভরে মাথা ঝুঁকিয়ে, বাও করে, চলে গেলেন।

॥ ৪ ॥

আমাদের ফ্লাইটটা ঘন্টাখানেক ডিলেড ছিল। বোয়িং। ভিতরে অ্যাকাসিয়া গাছ আর লম্বা-গলা জিরাফের ছবি আঁকা। প্লেনটা ট্যাক্সিইং করে টেক-অফ করার পরই সীট-বেল্ট খুলে ফেলে পা এলিয়ে দিলাম। পরশু, সেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হোটেলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরে জোর ঘুম লাগিয়েছিলাম। বিকেলে ঋজুদা একাই বেরিয়েছিল কোথায় যেন। রাতে আমরা ঘরের চাবি পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম ট্যাক্সি করে। পথে তিনবার ট্যাক্সি বদল করে এবং সমুদ্রের পারের বড় বড় পাম গাছের ছায়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মেক-আপ নিয়ে সমুদ্রপারেরই ছোট্ট একটি হোটেলের কটেজে রাত এবং কালকের সমস্তটি দিন শুয়ে বসে গল্প করে কাটিয়ে ছদ্মবেশেই আজ সকালে এয়ারপোর্টে পৌঁছে এই ফ্লাইট ধরেছি। আমাদের বেশির ভাগ মালপত্রই রেখে এসেছি মাউন্ট কিলিমানজারো হোটেলে। জাঞ্জিবারের টিকিটগুলো এবং আসল পাসপোর্টও। নেহাত যা না-আনলেই নয়, তা ছাড়া কিছুই সঙ্গে আনতে পারিনি। তিতিরের ক্যামেরা, বাইনোকুলার সব-কিছুই রয়ে গেল। ঋজুদা অবশ্য বলেছে, সবই পাওয়া যাবে পরে, খোয়া যাবে না কিছুই। তবে কাজের জায়গায় কাজে লাগবে না, এই-ই যা।

আমরা তিনজন পোর্ট-সাইডে পাশাপাশি তিনটি সীটে বসেছি। ইংরেজিতেই কথা বলছি। তাই খোলসা করে কিছুই বলা যাচ্ছে না। এয়ার-হোস্টেস্ খবরের কাগজ দিয়ে গেল। কাগজ হাতে নিয়েই চোখ একেবারে ছানাবড়া। ঋজু বোস তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রী এবং একমাত্র শ্যালকের সঙ্গে বসে আছেন। সেই ছবি, কাগজের প্রথম পাতায়।

আমার মনে হল, এর পরে মরে গেলেও আর আমার দুঃখ নেই। খবরের কাগজে ছবিই যখন ছাপা হয়ে গেল। আর কী?

ছবির নীচে বড় বড় হরফে খবর। "হোটেল গেস্টস্ মিসিং। ডিস্অ্যাপীয়ারেন্স অব থ্রী ইণ্ডিয়ানস্ ফ্রম হোটেল কিলিমানজারো, শ্রাউডেড ইন মিস্ট্রি।"

নীচে সবিস্তারে ধানাই-পানাই।

আমি, সরি, জন অ্যালেন, ভুরু কুঁচকে বলল, "হোয়াট ডু উই থিংক?"

ক্রিস্ ভ্যালেরি আমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, "ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড। আই ওন্ট বী সারপ্রাইজড্ ইফ্ দে আর কাউণ্ড জেড !"

পাশের সীটে বসা একজন তানজানিয়ান পুলিশ-অফিসার তিতিরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে, কায়দা করে বাবার মতো বললাম, "মাই ! মাই ! ওয়েল্ ইট কুড বী !"

ঋজুদা খবরের কাগজের এক কোনায় বলপেন বের করে খস্ খস্ করে কী যেন লিখে আমাদের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিল। দেখি, বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা—অত পুটুর-পুটুর কথা কিসের ? চুপচাপ ঘুমো।

ঋজুদার লিখন দেখে মিস ভ্যালেরির পিকে-প্রেস্টিজ একেবারে পাচারড হয়ে গেল। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "ভারী অসভ্য ঋজুকাকা !"

তিতিরের কানের মধ্যে আমিও প্রায় ঠোঁট ঢুকিয়ে বললাম, "উই ! উই ! মাদমোয়াজেল !"

ফ্রেঞ্চের "উই" মানে যে ইংরিজি 'ইয়েস', মাত্র এইটুকু ফ্রেঞ্চ কৃপণ তিতির এ'কদিনে শিখিয়েছিল আমাকে। একটি শব্দ দিয়েই গুরুবধ করে দিলাম। একেই বলে, গুরু গুড়, চেলা চিনি।

ঘুম লাগাবার আগে তাকিয়ে দেখলাম ঘুমন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সর্দার গুরিন্দার সিং-এর সাদা গোঁফ, সাহেব-তেলাপোকার শুঁড়ের মতো ফুরফুর করে উঠছে প্রতিবার নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। আর ক্রিস্ ভ্যালেরি যে এতটা সুন্দরী তাও এর আগে কখনও খেয়াল করে দেখিনি। এদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছিরি, ফল্‌স-দাঁতের দৈত্যো—জন অ্যালেন্ একেবারেই বেমানান। হংসে মধ্যে বক যথা।

ঘুম তিনজনেরই বোধহয় বেশ ভালই এসেছিল। এয়ার হোসটেস্ সোয়াহিলি অ্যাকসেন্ট-মেশা খ্যানখ্যানে ইংরিজিতে যখন প্লেনের যাত্রীদের জানাল যে, প্লেন এক্ষুনি কিলিমানজারো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামবে, তখনই সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

এয়ারপোর্টের কাছেই মোশি। পুব-উত্তরে গেলে, কিবো হয়ে, মাউন্ট

কিলিমানজারো। পশ্চিম-দক্ষিণে আরুশা। যেখানে আমরা যাব।

প্লেনটা নামতেই, চোখ জুড়িয়ে গেল। একেবারে টারম্যাকের পিছনেই পদুমামার টাক-মাথার মতো গোলগাল বরফ-ঢাকা কিলিমানজারো। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। তিতির, সরি, মিস ভ্যালেরি, উত্তেজনায় আমার কোমরের কাছে কুটুস করে চিমটি কেটে দিল একটা। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "আর্নেস্ট হেমিংওয়ে : স্নোজ অব কিলিমানজারো।"

ঋজুদা বলে দিয়েছিল, নেমে আমরা কেউই কাউকে চিনব না। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে মাউন্ট মেরু হোটেলে গিয়ে পৌঁছোব আরুশাতে। হোটেলে চেক-ইন্ করে কোনো কায়দায় জেনে নেব, কে কত নাম্বার ঘরে আছি। তারপর, ডাইনিংরুমে আলাদা আলাদা ডিনার খেয়ে ঋজুদার ঘরে রাত দশটার সময় মিটিং।

এয়ারপোর্টের ভিতরটাও দারুণ। ঝকঝকে পালিশ-করা কাঠের মেঝে, ঝাঁক-ঝাঁক ফুটফুটে, অল্পবয়সী ইয়োরোপিয়ান ছেলেমেয়ের 'হাই'-'হাই' চিৎকারে ব্লাডপ্রেসার হাই হয়ে যাওয়ার উপক্রম সকলেরই।

সকলেই দেখি, আমার সামনে এসেই কেমন ভড়কে-যাওয়া মুখ করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় পচা-ইঁদুর পড়ে থাকলে আমরা যেমন করি, কলকাতায়। ব্যাপার বুঝলাম, জেন্টস-রুমে গিয়ে। আমার ফল্‌স্ দাঁতটা আধখানা খুলে গেছে। বড়ই ব্যথা পেলাম নিজের মূর্তি দেখে। একসট্রিমলি গুডলুকিং মিস ক্রিস্ ভ্যালেরি এবং সর্দার গুরিন্দার সিং-এর দিকে একবারও না-তাকিয়ে মনের দুঃখে বেরিয়ে পড়লাম ট্যাক্সি নিয়ে।

আমাদের দেশেরই মতো কুঁড়েঘর, ন্যাংটো ছেলেমেয়ে, ন্যুব্জ, গরিব বুড়োমানুষ, টায়ার-সোলের জুতো-পরা। মকাইয়ের খেত, তেঁতুলগাছ। একই রকম দারিদ্র্য, হতাশা। তারই মধ্যে কুইক-কুইক শব্দ করে দুধসাদা এয়ারকণ্ডিশণ্ড মার্সিডিস্ গাড়ি করে কফি প্ল্যানটেশনের এশিয়ান, আফ্রিকান বা ইয়োরোপিয়ান মালিকরা অন্য গ্রহের বাসিন্দাদের মতোই চলে যাচ্ছেন।

গতবার ডার-এস-সালাম থেকে সোজা সেরেঙ্গেটিতে জোড়া প্লেনে করে পৌঁছে যাওয়ায়, আফ্রিকার জনপদ দেখার সুযোগ ঘটেনি। এবারে সেই

মুখোশ খসল।

এয়ারপোর্ট থেকে আরুশা অনেক মাইল পথ। পৌঁছোলাম যখন, তখন শেষ-বিকেল। ভাল ঠান্ডা। সাজানো, শহরের মতো খুব একটা বেশি নেই। বেশ উঁচু পাহাড়ি শহর। এখানে-ওখানে অনেকরকম গাছ আছে। সুন্দর কমলা-রাঙা ফুল এসেছে। এই ফুলগুলিকেই বলে আফ্রিকান টিউলিপ। শান্তিনিকেতনে এই গাছ অনেক আছে। আমাদের বর্ষাকালে আফ্রিকাতে শীতকাল। এ অঞ্চলে তো বেশ ভালই শীত। প্রায় দার্জিলিঙেরই মতো। শহরের দিকে উঁচু মাথা ঝুঁকিয়ে চেয়ে দেখছে মাউন্ট মেরু। ঐ উঁচু পাহাড়ে মাসাইদের বাস। আমাদের বন্ধু নাইরোবি-সর্দারের কাজিনরাই থাকে হয়তো।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে চেক-ইন করছি হোটেলে, হঠাৎ একেবারে ভুষুণ্ডার সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা। ভূত দেখলেও এত চমকাতাম না। একটা হাইরেঞ্জ উরস্টেড ফ্ল্যানেলের বিজনেস-স্যুট পরেছে। মুখে মীরশাম পাইপ। আমি তো দেখে থ। হালচালই পালটে গেছে।

ওকে দেখেই আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল।

আমার দিকে তাকিয়েই ও মুখ ঘুরিয়ে নিল। হৃৎপিণ্ড ধক করে উঠল। পরক্ষণে বুঝতে পারলাম, আমাকে চিনতে পারেনি ভুষুণ্ডা। জন অ্যালেনের এমন সুন্দর চেহারা দেখে ভিরমি লেগেছে কুৎসিত ভুষুণ্ডারও।

মাউন্ট মেরু আরুশার সবচেয়ে ভাল হোটেল। সেই হোটেলেও দেখলাম ভুষুণ্ডাকে সকলে বেশ খাতির-টাতির করছে। মোটা বকশিস দেয় সকলকে নিশ্চয়ই।

আড়চোখে তাকালে সন্দেহ হতে পারে, তাই আমি সোজাসুজিই ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম রিসেপশান কাউন্টারে দাঁড়িয়েই। ভুষুণ্ডার এত কাছে কার্পেট-মোড়া হোটেলে দাঁড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

হঠাৎ একটা পরিচিত স্বর কানে এল আমার। অথচ, খুব-চেনা কারো স্বর নয়। লোকটা ভাঙা-ভাঙা ইংলিজিতে কথা বলতে বলতে কিউরিও-শপের সামনে দিয়ে আসছিল। এখুনি আমার সামনে বেরোবে এবং বেরোলেই তাকে দেখতে পাব। কোথায় যে তার কথা শুনেছি, মনে করতে পারছিলাম না।

লোকটি দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল লবিতে, অন্য দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে; আর ঠিক সেই সময়ই তিতির নামল ট্যাক্সি থেকে।

আরে, ওয়ানাবেরি! ওয়ানাবেরি! আমি দেখলাম, তিতিরও ওয়ানাবেরিকে দেখেই চিনেছে, কিন্তু না-চেনার ভান করে গটগট করে স্মার্টলি ওর সামনে দিয়েই হেঁটে এল রিসেপশানের দিকে। তিতিরকে দেখে আমার মনে হল, মেয়ে মাত্রই খুব ভাল অ্যাকট্রেস হয়।

ওয়ানাবেরি তিতিরের হাঁটার ভঙ্গির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে সঙ্গের দুজন লোককে কী যেন বলল সোয়াহিলিতে, চাপা গলায়।

ভুষুণ্ডাকে কিন্তু ওয়ানাবেরি আগে চেনে বলে মনে হল না। ভুষুণ্ডাও বোধহয় চেনে না।

সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে একটুও শোভন হচ্ছিল না। কাউন্টারে স্লিপ-প্যাড পড়ে ছিল। তাতে খসখস করে লিখলাম, বাংলায়, "চেক-ইন করেই নিজের ঘরে চলে যাও তাড়াতাড়ি। আমার ঘরের নাম্বার একশো তিন। একটুও বাহাদুরি কোরো না। এইসব জান্তব মানুষরা কোনট্রোকির ছোট-ছোট টিনের বাক্স নয়।"

তারপরই আর একটি কাগজে লিখলাম ঋজুদার জন্যে, "বন্ধুরা হাজির। নতুন-পুরনো সব। তাড়াতাড়ি ঘরে যাও।"

লিখেই প্যাড-সুদ্ধ ওইখানেই রেখে তিতির কাউন্টারে পৌঁছতেই কাউন্টার ছেড়ে পোর্জ-এর সঙ্গে এলিভেটারের দিকে এগোলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছবার আগেই গুড়ুম করে একটি শব্দ হল। ফাঁকা জায়গায় শব্দ অন্যরকম শোনায়। শব্দটা প্রচণ্ড জোর মনে হল। ওয়ানাবেরির একজন সঙ্গী অন্যজনকে গুলি করেই কেউ কিছু করবার আগেই বাইরের দরজার দিকে জোরে দৌড়ে গেল। ঋজুদা ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সবে দরজা দিয়ে ঢুকছিল। আড়চোখে দেখলাম। লোকটার সঙ্গে ঋজুদার মুখোমুখি ধাক্কা লাগল আচমকাই। ধাক্কা লাগতেই, লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে ঋজুদার বুকে পিস্তল ঠেকাল। ভেবেছিল বোধ হয় ঋজুদা ওকে আটকাতে চাইছে। আমার ঘড়িটা থেমে গেল। ঘাড়ের কাছে ঠান্ডা লাগতে লাগল। দেখলাম, তিতিরের হাত কোমরের কাছে, আমার

অজান্তে আমার হাতও কোমরে উঠে গেছিল।

কিন্তু, কিছুই হল না।

ওয়ানাবেরি সাংঘাতিক স্বরে বলে উঠল, "বুই বুই! লেগা জাকো। মাথা মাথা!"

বলতেই, লোকটা এক ধাক্কায় সর্দার গুরিন্দারের সাদা দাড়িটা প্রায় উপড়ে দিতেই ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল। দাড়ি উপড়ে গেলে যে কী কালশিটে হয় সে কথা বলার নয়।

ভুষুণ্ডা তখন বুকে-গুলি-লাগা মাটিতে-পড়ে-যাওয়া মানুষটির দিকে চেয়ে প্যান্টের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে, কাঁধ শ্রাগ করে স্বগতোক্তি করল, "কুনা নিনি হাপা?"

ওয়ানাবেরি জিরাফের মতো দুখানি লম্বা পা ফাঁক করে রক্তে ভেসে যাওয়া পুরু কার্পেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে হোটেলের কর্মচারীদের চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যেই মাথা নেড়ে যেন কিছুই ঘটেনি এমনভাবে স্বগতোক্তি করল, "সিজুই, সিজাহামু!"

ঘরে ঢুকেই চায়ের অর্ডার দিলাম। এমন সময় ফোনটা বাজল।

তিতির ইংরিজিতে বলল, "হাই! মিস্টার আলেন। হোয়াট আর ইওর প্ল্যানস্ ফর দ্য ইভিনিং? আই প্রেফার টু স্টে ব্যাক ইন মাই রুম। হাউ বাউট ইউ?"

আমি বুঝলাম যে, ঋজুদা নিশ্চয়ই ওকে ঘরেই থাকতে বলেছে।

বললাম, "আই অ্যাম অলসো টায়ার্ড। ডোন্ট ফিল্ লাইক গোয়িং আউট।"

"ওকে দেন। গুড নাইট।"

"গুড নাইট।"

আবার ফোন বাজল। এবার ঋজুদা।

চাপা হাসির সঙ্গে বলল, "বোঝতাছেন কি কর্তা? নাটক দেহি জইম্যা গেল, আইতে না আইতেই? একতারাটারে এট্টু ঠিকঠাক রাইখ্যেন। কহন গান গাইতে অইব কওন যায় না। বোষ্টমীরেও এট্টু কইয়া দিবেন, সময় বুইঝ্যা! বোঝলেন?"

তারপরই বলল, "প্রয়োজন অইলে আপনাগো ফোন করুম। দরজায়

খিল লাগাইয়া কাবিনেই বইস্যা থাকেন। বদর! বদর! আজ আর ছিন-ছিনারি দেইখ্যা কাম নাই, নদীর গতিক ঠিক মনে অইতেছে না।"

আমি কী বললাম, তা বোঝার আগেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হু! হু! বেশি কওন লাগব না। বুঝছি!"

আসলে আমি তো বাঙালই। কিন্তু মা বিহারে মানুষ বলে বাঙাল ভাষা বলতে পারেন না। বাবা যদিও বলেন। এর জন্যেই বলে মাদার-টাং। থাকলে টাঙ্গি, না-থাকলে নেই।

ফোনটা ছেড়ে দিতেই দরজার বেল বাজল। কোমরে হাত দিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করলাম।

দেখলাম, বেয়ারা।

চা-টা ভিতরে নিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিলাম। চা খেতে খেতে রেডিওটাও খুলে দিলাম। সন্ধ্যার খবর বলছে। "রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ তিনজন ভারতীয় টুরিস্টদের এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ সন্দেহ করছে যে, ওদের হয়তো খুন করে ফেলেছে কেউ বা কারা। সুন্দরী, অল্পবয়সী মেয়েটিরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। কারণ তাঁদের হোটেলের ঘর থেকে এমন এমন জিনিস পাওয়া গেছে, যা সাধারণ টুরিস্টদের কাছে থাকে না। কাল সকাল দশটায় দার-এস-সালামের পুলিশের বড়সাহেব ইন্টার-ন্যাশনাল প্রেসের রিপোর্টারদের সামনে এক বিবৃতি দেবেন।"

জলজ্যান্ত মানুষটা কী করে চোখের সামনে পড়ে গেল গুলি খেয়ে, সেই কথাই ভাবছিলাম। খুন তো আমিও করেছি, কিন্তু সে তো নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই খুনটা কোল্ড-ব্লাডেড। মরে গেছে নির্ঘাত। অত ক্লোজ-রেঞ্জ থেকে পাকা হাতের গুলি খেয়ে কোন নিয়মিত গুলিখোরের পক্ষেও বাঁচা সম্ভব নয়।

তিতির কিন্তু অত রক্ত দেখেও ঘাবড়াল না একটুও। আশ্চর্য! ও আসলে মেয়ে কি না, আমার সন্দেহ হচ্ছে। ও-ও বোধহয় শেষকালে আরেকজন ভুষুণ্ডার মতো আমাদের দুজনকে এবার খতম করবে! এত সুন্দর মানুষের মেয়ে হয় না। এত গুণেরও হয় না।

ওয়ানাবেরি আর ভুষুণ্ডা যে একে অন্যকে চেনে না এটাও এক নতুন

হচ্ছে। ওরা দুজনে একই দলের লোক হলে, তাও হত। এখন দেখা যাচ্ছে, এরা ভিন্ন-ভিন্ন দলের লোক। গোদের উপর বিষফোড়া। শত্রু তাহলে দলে-দলে। চিজ-টু দিয়ে চা খেয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে, জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

হ্যালোজেন ভেপার-এর কমলা আলোয় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে রাতের আরুশা শহরটিকে। অনেক ট্রাক যাচ্ছে। বড় বড় অস্ট্রেলিয়ান ট্রাক। জিপ, নানারকম ধোঁয়ার এঞ্জিনে গাঁক-গাঁক আওয়াজ তোলা ঝাঁক-ঝাঁক বিদেশী গাড়ি। রাতের শহরটাকে কেমন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে, রহস্যময় বলেও মনে হচ্ছে। কে জানে? লোকটা বাঁচল না মরল। মরেই গেছে নিশ্চয়ই এতক্ষণ। লোকটা কে? আর যে ওকে মারল, সেই বা কে? ওয়ানাবেরির সঙ্গে এদের কী সম্পর্ক? ভুমুগা, ওয়ানাবেরি—সব এখানে কী করতে এসেছে? ওরা কি জেনে গেছে আমাদের আসার কথা? ওয়ানাবেরি কি তিতিরের হাঁটার ভঙ্গি দেখে তিতিরকে চিনতে পেরেছে? না বোধহয়। না হলেই ভাল।

এয়ারপোর্টে ঋজুদা আমাকে এবং তিতিরকে একটা করে খাম দিয়ে বলেছিল, আরুশাতে পৌঁছেই ভাল করে পড়ে নিস।

খামটা বের করে, বিছানার একপাশে শুয়ে বেড-সাইড ল্যাম্প জ্বেলে কাগজগুলো বের করলাম। বের করতেই, একটা ম্যাপ বেরুল। এবং কিছু ফোটোস্ট্যাট করা কাগজ।

ম্যাপটা তানজানিয়ার। খুলে, মেলে ধরলাম খাটের উপর।

আমরা যেখানে এখন আছি আরুশাতে, তার উত্তর-পুবে মাউন্ট কিলিমানজারো। উত্তর-পশ্চিমে সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক—গোরোংগোরো ক্র্যাটার হয়ে। দক্ষিণ-পশ্চিমে টারাঙ্গিরে ন্যাশনাল পার্ক। সেরেঙ্গেটি ছাড়িয়ে আরুশার সমান্তরাল রেখাতেই প্রায় মোয়াঞ্জা। লেক ভিক্টোরিয়ার দক্ষিণ-পুব প্রান্তে। তানজানিয়ার পশ্চিমে রুয়াণ্ডা এবং বুরুণ্ডি। তার সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে লেক টাঙ্গানিকা। তারও পরে জায়ের। কঙ্গো নদী বয়ে গেছে যেখানে।

দেখলাম, ম্যাপের মধ্যে লাল কালি দিয়ে "ইরিঙ্গা" বলে একটি জায়গাকে দাগ দিয়ে রেখেছে ঋজুদা। ইরিঙ্গা, আরুশার অনেকটা

দক্ষিণে। যেখান থেকে এলাম আমরা, সেই দার-এস-সালাম থেকে বরং অনেক কাছে। দার-এস্-সালামের সমান্তরালে, সামান্য দূরে ডোডোমা। সেই ডোডোমার দক্ষিণে ইরিঙ্গা। ইরিঙ্গা থেকে লেক নীয়াসা সবচেয়ে কাছে। রুকোয়া বলেও একটি ছোট্ট লেক আছে আরও কাছে। কিলিমানজারোর মতো ইরিঙ্গাতেও বড় এয়ারপোর্ট আছে। তবে, কিলিমানজারো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। এখান থেকে লণ্ডন, প্যারিস, টোরোন্টো, ন্যু-ইয়র্ক, টোকিও, হংকং, ব্যাংকক, ইস্তাম্বুল, বেইরুট, দুবাই, বাগদাদ, মসকো, লেনিনগ্রাড, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট, বুডাপেস্ট, স্টকহোম, কোপেনহাগেন, অসলো, হেলসিঙ্কি, ফ্রাঙ্কফুর্ট, বার্লিন, জুরিখ, ভিয়েনা, ব্রাসেলস, আমস্টারডাম এবং রোমের ডাইরেক্ট ফ্লাইট আছে।

এত লম্বা ফিরিস্তি এই জন্য দিলাম যে, সমস্ত পৃথিবীর চোরা শিকারের সামগ্রী এখান থেকে যে-কোন জায়গাতেই যেতে বাধা নেই। তবে, হাতির দাঁত, সিংহ, জিরাফ, জেব্রা এবং নানারকম গ্যাজেলস, ওকাপি, কুডু এসবের চামড়া প্লেনে করে চালান বেশি যায় না। হিপোপটেমাসের দাঁতও ভারী হয় বলে প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া মুশকিল। প্লেনে বেশি যায় হাতির লেজের চুল, যা দিয়ে সুন্দর বালা তৈরি হয়, গণ্ডারের খড়গের গুঁড়ো ইত্যাদি।

ঋজুদার দেওয়া নোট পড়ে মনে হল, আমাদের এখান থেকে যেতে হবে ইরিঙ্গা। ইরিঙ্গা থেকে হয় ছোট প্লেনে উড়ে পাজরা যেতে হবে, নয়তো পথ দিয়ে, ল্যাণ্ডরোভারে। ঐ অঞ্চলেই গ্রেট রুআহা নদী বয়ে গেছে। রুঙ্গোয়া গেম রিসার্ভ এবং রুআহা ন্যাশনাল পার্ককে লাল কালি দিয়ে গোল করে দাগ দিয়ে রেখেছে দেখলাম।

বুঝতে পারলাম না, ইরিঙ্গাই যদি যাব, তো এখানে এলাম কেন, এমন নাক ঘুরিয়ে কান ধরার কি মানে হয়? তবে মানে নিশ্চয়ই হয়। নইলে ঋজুদা আসবেই বা কেন?

এক শতাব্দী আগে বহু মিলিয়ন হাতি ছিল এই আফ্রিকাতেই। আয়ান ডগলাস হ্যামিলটন প্রাণিতত্ত্ববিদ এবং আফ্রিকান হাতির উপরে একজন অথরিটি; যিনি পুব আফ্রিকার ইভালা নদীর পাশে বছরের পর বছর হাতিদের উপর গবেষণা চালিয়েছিলেন একেবারে একা জঙ্গলে থেকে।

পরে, উনি অবশ্য বিয়ে করেন আরেকজন প্রাণিতত্ত্ববিদকেই। এবং ঐ জন্তুদেরই তাঁদের একটি সন্তানও হয়। ডগলাস হ্যামিলটনের রিপোর্টে উনি বলেছেন, পুরো আফ্রিকাতে আজকে বোধহয় তেত্রিশ লক্ষের বেশি হাতিও নেই। আফ্রিকা তো আর ছোট জায়গা নয়। কতগুলো ভারতবর্ষকে যে তার মধ্যে হারিয়ে দেওয়া যায় ছেসে-খেলে, তা পৃথিবীর ম্যাপ দেখলেই বোঝা যায়। ঋজুদা আণ্ডারলাইন করে দিয়েছে অনেকগুলো জায়গা। মার্জিনে লিখে দিয়েছে যে, আমাদের ঝগড়া ভুসুণ্ডা আর ওয়ানাবেরির সঙ্গে নয়। ওরা যাদের চাকর-মাত্র, তাদেরই বিরুদ্ধে। যাদের সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছি এবারে, তাদের চর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। কোটি কোটি টাকার মালিক তারা। তাদের স্বার্থহানি যারা করতে চায়, তাদের তারা ক্ষমা করে না। অতএব, সাবধানতা থেকে কোনো সময় একটুও সরে আসা মানেই নির্ঘাত মৃত্যু। আরও লিখেছে, পিস্তলে তিতিরের হাতই ভাল, না তোর হাত, এই ছেলেমানুষি ঝগড়াতে যাবার সময় এখন নেই। এখানে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর ছায়ায়, ওয়ানাবেরির, মানে মৃত্যুরই, মুখোর মধ্যে দিন কাটাতে হবে।

বুঝলাম যে, রুই-কাতলা ধরবে বলেই, ঋজুদা ভুসুণ্ডা আর ওয়ানাবেরিকে দেখার পরও একটুও উত্তেজিত হয়নি।

কেনিয়ার প্রাণিতত্ত্ববিদ কেস হিলম্যান (আফ্রিকান রাইনোগ্রুপ অব ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্যা কনসার্ভেশন অব নেচার অ্যাণ্ড ন্যাচারেল রিসোর্সেস-এর চেয়ারম্যান), আয়ান পার্কার, বন্যপ্রাণী-বিশারদ, কানাডিয়ান ইকোলজিস্ট রবার্ট হাডসন, বিখ্যাত ন্যাচারালিস্ট, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের চেয়ারম্যান স্যার পিটার স্কট ইত্যাদির রিপোর্টের কাটিংও ফোটোস্টাট করে দিয়েছে ঋজুদা নিজের নোটের সঙ্গে। বাংলায় হাতে লিখেছে, "তোরা এগুলো না পড়লে, আমাদের উদ্দেশ্যর মহত্ত্ব ও বিপদ সম্বন্ধে ধারণা হবে না। একরকমের যুদ্ধই করতে এসেছি আমরা। যাদের নৈতিক চরিত্র নেই, যারা ন্যায়ের জন্যে লড়ে না, তারা কখনই কোনো যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জেতে না। অন্যায় চিরদিনই হেরে যায় ন্যায়ের কাছে। হয়তো সময় লেগেছে, হয়তো দাম দিতে হয়েছে অনেক; কিন্তু ন্যায়ই জিতেছে চিরদিন। তোদের যদি আমাকে এখানেই

দাহ করে ফিরে যেতে হয়, তাহলেও দুঃখ নেই। দুঃখ করিস না তোরা। তুই আর তিতির, আমি যা করতে পারিনি, তা যদি করতে পারিস তো শুধু আফ্রিকাতেই নয়, সারা পৃথিবীতেই তোরা দুজনে নায়ক-নায়িকা হয়ে যাবি। তোরা ছেলেমানুষ যদিও, কিন্তু তোদের উপর আমার ভরসা অনেক। নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখবি। পিস্তলের নিশানার চেয়েও বিশ্বাসের জোর অনেক বড়। আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাস রাখলে, বিশ্বাস তোদের কখনও অমর্যাদা করবে না।"

এর পরে, কী-ভাবে চোরা-শিকারিরা বিভিন্ন জানোয়ার মারে, কী ভাবে ট্রাকে, স্টিমারে, মানুষের মাথায়, সি-১৩০ কার্গো প্লেনে করে এই সব মাল চালান দেয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে ঋজুদা।

আজ আর সব পড়তে ইচ্ছে করছে না। তবে, পড়ে ফেলতেই হবে। কারণ গতবারে ভুসুণ্ডার গুলিতে ঋজুদা আহত হওয়ার পর একা পড়ে যাওয়াতে যে কি অসহায় হয়েই পড়েছিলাম তা আমার মতো আর কেউই জানে না। ঋজুদা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, জিজ্ঞেস করবই বা কাকে? জানার যা-কিছু, তা সবই ভাল ভাবে জেনে নিতে হবে। পথ-ঘাট, নদী-নালা, এয়ারপোর্ট। আমরা তিন কম্যাণ্ডো এসেছি বিরাট, সুগঠিত শক্তিশালী এক চক্র ধ্বংস করতে। যুদ্ধের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমার আর তিতিরের জেনে নিতে হবে বই কি!

॥ ৫ ॥

সকালে চান-টান করে আমরা যে যার ঘরে একা একা ব্রেকফাস্ট খেলাম। তারপর ঋজুদার নির্দেশে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে বেরিয়ে গেলাম হোটেল থেকে।

তিতির তানজানিয়ান এয়ার লাইনস্-এর সামনে আর আমি তানজানিয়া মিরশ্যাম্ কোম্পানির সামনে পায়চারি করব, এমন নির্দেশ ছিল।

যথাসময়ে একটা গাঢ় চকোলেট-রঙা ভোকস্‌ওয়াগন-কম্বি গাড়ি এসে তিতিরকে এবং আমাকে তুলে নিল। তারপর গাড়িটা জোরে ছুটে চলল। দেখতে দেখতে আকাশমণি গাছে ছাওয়া উঁচু-নিচু পথ বেয়ে আমরা ফাঁকা জায়গাতে এসে পড়লাম।

হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া আসছিল। যদিও এখানে সেরকম মাছির ভয় নেই, কিন্তু বেশ ঠান্ডা আছে একবারে রোদের উত্তাপেও। কাঁচ তুলে দিলাম গাড়ির।

ঋজুদা কথা বলছিল না। খুব মনোযোগ সহকারে গাড়ি চালাচ্ছিল। আবসলিউটিক হওয়ার পর আমরা যখন খুব চওড়া পথ পেয়ে একেবারে ফাঁকায় পৌঁছেছি, তখন গাড়িটা বাঁ দিকে থামিয়ে ঋজুদা নামল। পথের দুদিকে ভাল করে দেখে নিয়ে আমাকে বলল, "রুদ্র, তুই-ই চালা। দুদিকের গোত্রায় একটু দৃষ্টি দিতে হবে।"

তিতির বলল, "আমি চালাব ঋজুকাকা। তাহলে তোমরা দুজনে আলোচনা করতে পারবে।"

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, "আমার সঙ্গে ঋজুদার আবার কিসের আলোচনা! তুমি তোমাকে যত আমাকে একটু বেশি ইম্পর্টান্ট ভাবছ তিতির।"

ঋজুদা বলল, "নাউ, স্টপ দ্যাট রুদ্র। তিতিরই চালাক গাড়ি।"

যথারীতি পাইপ টেনেটুনে তাতে দেশলাই ঠুকে শ্মশানের সাধুবাবাজির কল্কের ধোঁয়ার মতো ধোঁয়াতে গাড়ি ভরে দিয়ে তারপর গোম হয়ে বসে রইল। বুঝলাম, এমার্জেন্সি-টিকিট গোয়িং অন। এখন কথা বললেই ঝাঁটা-টাটা খেতে হতে পারে।

পথে, উল্টোদিক থেকে আসা একটি মার্সিডিজ গাড়ি আর একটি সাদা ল্যান্ডরোভার চোখে পড়েছিল শুধু। যান এবং জনশূন্য পথ পেরিয়ে চলেছি। দুদিকে শুধু মাঠ, ঝোপঝাড়, নানারকম পার্ট্রিজ ও আফ্রিকান লাখি পথ পেরোচ্ছে দ্রুতগতিতে।

আরও আধ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর তিতিরই প্রথম কথা বলল।

"ঋজুকাকা, আমরা ঠিক যাচ্ছি তো?"

"ঠিকই যাচ্ছি। তবে, সামনে গিয়ে ডান দিকে একটা কাঁচা রাস্তা পাবি। তাতে ঢুকে পড়তে হবে। সেই কাঁচা পথটাই চলে গেছে লেক মানিয়ারা, গোরোংগোরো ক্রাটার, ওলডুভাই গর্জ এবং সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এর দিকে।"

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "এ কী! এ তো মাকুউনির মোড়!"

"আজ্ঞে!" ঋজুদা বলল। তারপর বলল, "আপনার মনে তো থাকারই কথা রুদ্রবাবু!"

"মনে আছে, মনে আছে।"

মাকুউনিতে এসে ডান দিকে ঘুরেই রাস্তাটা কাঁচা তো বটেই, বেশ খারাপ হয়ে উঠল।

ঋজুদা এবার তিতিরকে উদ্দেশ করে বলল, "মা গো! এবারে রুদ্রকে দাও। জঙ্গলে গাড়ি চালানোটা কিন্তু তোমার রুদ্রর কাছেই শিখতে হবে।"

তিতির ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে গিয়ে পেছনে উঠল। আমি ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে নিচু গলায় বললাম, "শুধুই গাড়ি চালানো?"

ঋজুদা বলল, "কথা কম। কিছুটা আগে গিয়ে একটা ছোট্ট বাজার পাবি। সেখানে শুধু কাঙ্গা-কিটেঙ্গা আর ইয়া-ইয়া কাঁদি কলা বিক্রি হয়। সেই হাটটাকে বাঁয়ে রেখে সরু কাঁচা পথে ঢুকে কুড়ি কিলোমিটার যাবি। মিটার দেখে। তারপর একটা খুব বড় তেঁতুলগাছতলায় গাড়িটা এমনভাবে রাখবি যাতে আকাশ থেকে কোনো প্লেন আমাদের দেখতে না পায়। তেঁতুলগাছটা তোর জন্যেই পুঁতে রেখেছি।"

তিতির বলল, "তারপর কী হবে ঋজুকাকা, বলো না?"

"অধৈর্য হয়ো না মাদাম। দেখতেই তো পাবে। নিজে দেখবে শুনবে বলেই তো এসেছ।"

"তা তো এসেছি। এদিকে খিদে পেয়ে গেছে যে। কটা বেজেছে জানো? কখন ফিরব হোটেলে? রাত হয়ে যাবে না ফিরতে ফিরতে?"

"হলে, হবে।" আমি বললাম।

এ যেন সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে ভেলপুরি খেতে বা ফুচকা খেতে বেরিয়েছে! সাধে বলে, পথি নারী বিবর্জিতা। ঋজুদার যত সব!

কুড়ি কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে ধুলোয় ধুলোক্কার হয়ে যখন সেই ষড়যন্ত্রর তিন্তিড়ী বৃক্ষের নীচে পৌঁছলাম, তখন ঘড়িতে একটা বাজে। খিদে আমারও পেয়েছে। ঋজুদার হাক্কিবিশাপি নাজিমসাহেবের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে, না-দানা, না-পানি, ক্যা বদকিস্মতি খের হয়রানি!

ঋজুদা দরজাটা খুলে পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলে বলল, "রুদ্র, নাইরোবি-সর্দারের সেই গোল পাথরটা কোথায়?"

"এই তো। আমার পকেটে।"

"ওটা হারাস না, নাইরোবি-সর্দার চাইতে পারে।" তারপরই বলল, "তিতির তুমি কখনও বাদুড়ের রক্ত খেয়েছ?"

"কিসের রক্ত?"

অবাক হয়ে তিতির শুধোলো।

"সুন্দর পুরুষ্টু নধর বাদুড়ের রক্ত।" ঋজুদা বলল।

"হাউ স্যাভেজ!" বলেই, তিতির মুখে 'আমি কিন্তু খেলব না' গোছের ভাব ফুটিয়ে ঋজুদার দিকে তাকাল। বলল, "না। নেভার!"

"তাইই! কিন্তু একটু পরেই খেতে হতে পারে। লাঞ্চে কী খাবি রুদ্র? চিকেন মেয়োনিজ, না কোল্ড-মিট?"

"তোমাকে সেৎসি মাছি কামড়ায়নি তো?" বিস্ময়-মেশানো হাসির চোখে ঋজুদার চোখে তাকিয়ে বললাম।

ঋজুদা অন্যমনস্ক চোখে হাতঘড়ির দিকে চকিতে চাইল একবার। স্বগতোক্তি করল, "নাঃ। উই আর রাইট অন টাইম।" তারপরই আমাদের দিকে ফিরে বলল, "একটা এক-এঞ্জিনের ছোট্ট আইল্যাণ্ডার প্লেনের শব্দ পাবি। পেলেই আমাকে বলিস। ততক্ষণে একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল সারা রাত অনেক হুজ্জোতি গেছে। ঘুম হয়নি একেবারে।"

তিতির অবাক চোখে বলল, "কাল রাতে? কী হয়েছিল ঋজুকাকা?"

"বলব, সব বলব। সময়মতো। এখন ঘুমোতে দে।" বলেই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিতির অবাক গলায় ফিসফিস করে শুধোলো, "সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল যে!"

মাথা নেড়ে উত্তর দিয়ে কান খাড়া করে রইলাম।

মিনিট-দশেক পর ফুলের বনে ভ্রমরের পাখার মতো আওয়াজ শোনা গেল একটা। আস্তে আস্তে জোর হচ্ছে শব্দটা। ঋজুদা চোখ-বন্ধ হেলান-দেওয়া অবস্থাতে বসেই বলল, "তিতির, তুই গাড়ি থেকে নেমে তেঁতুলতলায় গিয়ে দাঁড়া। তার আগে, রুদ্র, বাইরে গিয়ে দ্যাখ্ প্লেনের রঙটা হলুদ কি না। হলুদ হলে, তিতির ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়বে, আর তুই ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিতিরকে কাভার করবি। যদি ওরা না হয়?"

"কী বলছ, কিছুই বুঝছি না ঋজুদা।" অধৈর্য গলায় বললাম আমি।

"বুঝবি যে সব বুঝবি। এখন চুপ কর।"

আমরা দুজন গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। ঋজুদা ঘুমোতে লাগল। অদ্ভুত লোক।

নাইন-সিটার একটা হলুদ প্লেনই। আইল্যাণ্ডার। প্লেনটা তিতিরকে দেখতে পেয়েই দুবার ঘুরে ঘাসের মাঝের ফাঁকা মাঠে ল্যাণ্ড করে একটা হলুদ ধেড়ে খরগোশের মতো প্রায় লাফাতে লাফাতে এসে স্থির হল। এক সাহেব নামল প্লেন থেকে। আর একজন সাত ফিট লম্বা মাসাই সর্দার। নাইরোবি-সর্দার। গুগুনোগুম্বারের দেশের নাইরোবি-সর্দার!

আমি পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে গেলাম তার দিকে। সর্দারকে বললাম, "সর্দার! এই যে তিতির। আমাদের নতুন শাগরেদ।"

নাইরোবি-সর্দার বিন্দুমাত্র সময় ও কথা খরচ না করে পিচিক করে থুতু ফেলল নিজের কুচকুচে কালো কলার-কাঁদির মতো দশ আঙুলে আর তেলোতে। আর ফেলেই দু হাতের তেলোতে ঘষে, কষে তিতিরের দু গালে আর মুখে লাগিয়ে দিল সেই থুতু।

তিতির উ-উ-ব্যাওও গোছের একটা শব্দ করতেই আমি বললাম, "কথাটি কয়েছ কি প্রাণটি গেছে। এটাই ওদের আদর। এবং এই মানুষটির জন্যেই আমি আর ঋজুদা আজকে প্রাণে বেঁচে আছি—।" যা ঘটেছিল সেরেঙ্গেটিতে সেসব তো 'গুগুনোগুম্বারের দেশে'তেই লেখা হয়েছে সবিস্তারে।

এমন সময় সাহেবটি ঋজুদাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "হাই ঋজু!"

"হাই!" বলে, ঋজুদা গাড়ি থেকে নেমে এসে প্রথমে নাইরোবি-সর্দারকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আমাকে বলল, "গাড়ির পেছনে একটা বাক্স আছে, নিয়ে আয় তো।"

গিয়ে নিয়ে এলাম। ঋজুদা বাক্সটা খুলে ধরল। দেখলাম, বিভিন্ন রঙের গোটা-পঞ্চাশ মার্বেল। মানে গুলি। বন্দুকের নয়, মাটিতে গাব্বু করে খেলার গুলি।

সর্দারের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাক্সটা দু হাতে ধরে তিড়িং করে বাম্ম হাতেই এক খুশির হুংকার ছেড়ে সোজা এক লাফ দিয়ে জমি

থেকে ফিটচারেক অবলীলায় উঠেই আবার নেমে পড়ল।

ঋজুদা সাহেবটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল আমাদের। বলল, "ইনি হচ্ছেন মাইলস্ টার্নার। সেরেঙ্গেটির গেম ওয়ার্ডেন।"

মিঃ টার্নার তিতিরকে, সরি, পরমাসুন্দরী মিস ক্রিস্ ভ্যালেরিকে দেখে কোনো ভাই-ভাতিজার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধই করতে যাচ্ছিলেন বোধহয়।

ঋজুদা বলল, "শি ইজ আ কিড মাইলস্। জাস্ট আ কিড।"

তিতিরের মুখ লাল হয়ে গেল। বলল, "সার্টেনলি, আই অ্যাম নট।"

মাইলস্ টার্নার ওর মুখে এক বালতি অদৃশ্য ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলল, "ওকে বেবি! উ্য আর নট।"

একে নাইরোবি-সর্দারের দুর্গন্ধ থুতুতে মুখ ভর্তি। তারপর এই সব অপমান, তিতির এতদিন যা করেনি, এবার তাই করবে মনে হল। একেবারে "ভ্যা" করবে বলে মনে হল। বাঙালির মেয়ে বলে কথা!

ইতিমধ্যে প্লেনের ককপিট থেকে আরেকজন সাহেব নেমে এল।

সেই সাহেবটি নেমেই, হুলোবেড়ালের মতো ইয়াও ইয়াও করে দুবার ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে আড়মোড়া ভেঙেই ঋজুদাকে বলল, "হাই! ঋজু সিং! আই অ্যাম হাংরি! কাম, লেটস্ হ্যাভ লাঞ্চ।"

ঋজুদা হেসে বলল, "হোয়াটস্ দিস কনকশন? সে-এ-এ আইলার ঋজু, অর গুরিন্দার।"

কিন্তু মাইলস্ টার্নার উত্তরে হেসে বলল, "নাথিং ডুইং। ঋজু সিং সাউণ্ডস্ মাচ বেটার।"

তেঁতুলতলার ছায়ার দিকে এগিয়ে চললাম। খিদে কারোরই কম পায়নি। তারপর ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে আমরা সকলে বসে পড়লাম। বিরাট লাঞ্চ-বক্স থেকে চিকেন-স্যাণ্ডউইচ, ওয়াইল্ডবিস্ট-এর কোল্ড মিট, সরি, ভেনিসন্ কেকল। কী শক্ত রে বাবা! দাঁতে ছেঁড়া যায় না।

তিতিরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী খাচ্ছ? জানো?"

"জানি।"

"কী?"

"ওয়াইল্ডবিস্ট।"

"ওয়াইল্ডবিস্ট মানে কী? জংলি জানোয়ার?"

তিতির লেমোনেডের বোতলটা মুখে উপুড় করে এক ঢোক খেয়ে নিয়ে হাসল। বলল,"তুমি আমাকে কী ভাব বলো তো? আফ্রিকাতে সশরীরে আগে আসিনি বলে বুঝি আমার কিছুই জানতে নেই? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো একবারও না এসেই 'চাঁদের পাহাড়' লিখেছিলেন। তুমি কি পঞ্চাশবার এখানে এসেও একটি ঐ রকম বই লিখতে পারবে?"

"বোকা-বোকা কথা বোলো না। ওয়াইল্ডবিস্ট্ বানান করে বলো তো। তাহলেই বুঝব, ঠিক বলছ কি না।"

তিতির তেমনি হাসি-হাসি মুখেই কেটে কেটে বানান করল,"WILD BEEST. BEAST নয়। ঠিক আছে? তাছাড়া, এদের অন্য একটি নামও আছে। তা হচ্ছে 'ন্যু'।"

ঋজুদা উড়ো-সাহেবদের সঙ্গে বড় বড় কালো বোতলে হলুদ বুড়বুড়ি-ওঠা কী যেন খাচ্ছিল। মুখ দেখে মনে হল ঐ লেমোনেড তেতো খেতে। ঋজুদাকে শুধোলাম,'তেতো বুঝি?'আমার দিকে ফিরে বলল, "খাদ্য-খাদক খাবার সময় ঝামেলি করিস না তো! শুধু কচকচি।"

এই "খাদ্য-খাদক" কথাটার একটা ভূমিকা ছিল। 'বনবিবির বনে'তে যখন আমরা গদাধরদার সঙ্গে পার্সোনাল রিভেঞ্জ নিতে গেছিলাম সুন্দরবনের বাঘের বিরুদ্ধে, তখন সুন্দরবনের মাঝিমাল্লাদের ওরকমভাবে কথা বলতে শুনেছিলাম। 'খাদ্য-খাদক' বলতে তারা খাবার-দাবার বোঝাচ্ছিল।

তিতির আমার দিকে হাঁ করে তাকাল।

স্যাণ্ডউইচ্ মুখে পুরতে পুরতে বললাম, "বলব বলব,সবই বলব। এত অধৈর্য হলে হবে না।"

নাইরোবি-সর্দার বাঁশের চোঙে করে বাছুরের ফেনা-ওঠা টাটকা রক্ত এনেছিল। আমরা যে-সব খাচ্ছি সে-সব কুখাদ্য-অখাদ্য মুখে একেবারেই না দিয়ে নিষ্ঠাভরে ঐটোকাঁটা বাঁচিয়ে ঢকঢক করে গ্যালনখানেক গরমাগরম রক্ত গিলে ফেলে একটা আরামের ঢেকুর তুলল।

নাইরোবি-সর্দারকে কাছে পেয়ে বড় ভাল লাগছিল। এই মানুষটি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা না থাকলে আমি এবং বিশেষ করে ঋজুদা কি আর

গুণ্ডনোগুণ্ডারের দেশ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতাম গতবারে?

যে সাহেবটি প্লেন থেকে পরে নেমেছিলেন, তাঁর নাম, জানা গেল মারে ওয়াট্সন। ভদ্রলোক একজন অনারারি গেম-ওয়ার্ডেন। চোরাশিকারিদের উপর ভীষণ রাগ ওয়াটসন্‌সাহেবের।

খেতে-খেতে, কথা হতে হতে বেলা প্রায় তিনটে বাজল। আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে ফেজেন্টস্-এর ডাক ভেসে আসছিল। হাজারিবাগের কালি-তিতিরের ডাকের মতো। গাছ-গাছালির ছায়াগুলো নড়ে-চড়ে বসতে শুরু করেছে। পুব-আফ্রিকার মাটির গন্ধ উঠছে চারধার থেকে। আমাদের দেশের মাটির গন্ধের মতো নয়। দেশের মাটির গন্ধ বড়ই মিষ্টি।

ঋজুদা হঠাৎ বলল, "নাইরোবি-সর্দারের পায়ের ধুলো নে একবার রুদ্র।"

তিতির খাওয়া-দাওয়া করল বটে, কিন্তু সর্দার থুতু-মাখানোর পর থেকেই সে গুম হয়ে বসে ছিল। আমি নিচু হয়ে নাইরোবি-সর্দারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই সর্দার চমকে উঠে তিড়িং করে সরে গেল এক লাফে। হয়তো পায়ে সুড়সুড়ি লেগে থাকবে। যাদের যা অনভ্যেস!

প্রণাম করা হল না আমার। উল্টে আমার মুখে আর-এক প্রস্থ বাছুরের বোঁটকা রক্তের গন্ধ-মাখা থুতু লাগিয়ে আবার আদর করে দিল সর্দার। তার পর তিতিরকে কলার কাঁদির মতো বাঁ হাতের আঙুলে সাঁড়াশির মতো ভালবাসায় ধরে তাকেও আবার ডবল জম্পেস করে লাগিয়ে দিল। ফেয়ারওয়েল গিফ্‌ট বলে কথা!

মাইলস্ টার্নার আর ওয়াটসন্ যখন প্লেনের দিকে এগোতে লাগলেন তখন ঋজুদা নাইরোবি-সর্দারের কাছে এগিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে যেন কী বলল।

সর্দার ঋজুদার মাথার উপরে দু'হাত তুলে, থুতু-মাখা দু'হাতের তালু প্রথমে ঋজুদার দু'গালে ক্রিম লাগাবার মতো লাগিয়ে আবার মাথার উপরে তুলে অনেকক্ষণ ধরে গমগম্ করে কী সব মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল। সেই মেঘগর্জনের মতো স্বরে, ন্যাবা-ধরা বিকেলের হলুদ আলোয় একটি বাজে-পোড়া প্রকাণ্ড বাওবাব গাছের মতো সটান দাঁড়িয়ে কী যে বলে

চলল নাইরোবি-সর্দার, তার কিছুই বোধগম্য হল না। শুধু শিরদাঁড়া বেয়ে এক ভয়মিশ্রিত ঔৎসুক্যের অনুভূতি গাবুন-ভাইপার সাপের মতো হিস্-স্-স্ শব্দ করে দৌড়ে গেল মনে হল। নাইরোবি-সর্দারের সেই দীর্ঘ স্বগতোক্তি শুনতে শুনতে ঋজুদার চোখও যেন ছলছল করে উঠল।

প্লেনের এঞ্জিন স্টার্ট করলেন টার্নার। বুড়ো আঙুল দেখালেন বাঁ হাতের। ঋজুদা ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ধরল উপরে। প্লেন মুখ ঘুরল। প্রপেলারের শব্দ জোর হল। ওয়াট্‌সন মুখ বাড়িয়ে বললেন ঋজুদাকে, "সেম টাইম, সেম প্লেস, ডে-আফটার। ওকে?"

ঋজুদা ডান হাতের বুড়ো আঙুল তোলা অবস্থাতেই বলল, "রজার। হ্যাপি ল্যাণ্ডিং।"

তারপর প্রপেলারের আওয়াজে আর কিছুই শোনা গেল না। প্লেনটা তামা-রঙা মাঠের মধ্যে কিছুটা ট্যাক্সিইং করে একটা মস্ত হলুদ পাখির মতো নীলচে আকাশে পাক খেয়ে ক্রমশ ছোট হয়ে যেতে লাগল। তারপর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ল, প্লেনটা ঠিক যেখানে ছিল, সেই জায়গাটিতেই ওয়াইল্ডবিস্টের একটি ছোট্ট দল দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যখন ওদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির ঠাণ্ডা মাংস খাচ্ছিলাম তখন ওরা আমাদের দেখছিল।

ঋজুদা বলল, "বদহজম হবে। নির্ঘাত।"

বললাম, "নিজেরা সব গেম-ওয়ার্ডেন! আর এদিকে তো দিব্যি ওয়াইল্ডবিস্ট-এর কোল্ড মিট খাচ্ছে! তার বেলা?"

"বোকা! গেম-ওয়ার্ডেনরা নিয়মিতই শিকার করে। কোনো বিশেষ প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেলেই। পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে—"

তিতির সেনটেন্সটা কমপ্লিট করে বলল, "ব্যালান্সের।"

"রাইট।"

এবার ফেরার পালা। ঋজুদা কেমন গম্ভীর হয়ে ছিল। গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, "বুঝলি রুদ্র, সকলের ঋণ বোধহয় শোধা যায় না। পুরোপুরি তো নয়ই। কিছু কিছু ঋণ থাকে, যা শুধু স্বীকার করা যায় মাত্র। যেমন ধর, মা-বাবার ঋণ। দ্যাখ, যে-মানুষটা জীবন দিল আমাকে, তাকে বদলে দিলাম এক বাক্স মার্বেল। তিরিশ টাকা দাম।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "আসলে বোকারাই টাকাকে দামি মনে করে। টাকা দিয়ে সত্যিকারের দামি কিছুই বোধহয় পাওয়া যায় না। ভুসুণ্ডা তো টেডিকে খুন করল টাকার লোভে, আমাদের ও মারতে চেয়েছিল নিজে, এমন-কী নাইরোবি-সর্দারকেও মারতে চেয়েছিল তোকে দিয়ে জোর করেই গুলি করিয়ে; কিন্তু ও কি কখনও, সর্দারকে আমরা যে-রকম ভালবাসি তেমন কোনো দামি ভালবাসা পাবে পৃথিবীর সব টাকার বদলেও? ভালত্ব, ভালবাসা, এ-সবের দাম টাকা দিয়ে কখনও দেওয়া যায় না।"

তিতির রুমাল দিয়ে ভাল করে ঘষে ঘষে মুখ মুছছিল প্লেনটা চলে যাবার পর থেকেই। তারপর ব্যাগ থেকে টিশু পেপার বের করে। ভেস্‌লিনের শিশিতে ডুবিয়ে আবার ও মুখ মুছতে লাগল।

ঋজুদা বলল, "দেখিস, মুখের চামড়া উঠে না যায়। উঠে গেলে, এখানে কিছু পাওয়া যাবে না। স্বাস্থ্যবান লোকের ওয়েল-মেল্ট থুতু তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালই শুনেছি। কী বলিস রে রুদ্র? এত ঘষাঘষির কী আছে?"

তিতির চুপ করে রইল। বুঝলাম, কলকাতা থেকে বেরুনোর পর এই প্রথমবার জব্দ হয়েছে প্রমত্ত প্রমীলা।

শর্ট-ব্যারেলড্ পিস্তলের গুলির আওয়াজের মতো হঠাৎ ফেটে পড়েই, ফাঁসা ভিস্তির মতো ফেঁসে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল তিতির। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আনসিভিলাইজড, ক্রুড, বিস্টি, থু থু। থু-থু-থু—উঁ উঁ উঁ—উঁ-উঁ-উঁ—"

আহা! মেয়েদের কান্নার শব্দ যে এত মিষ্টি আমি তা কখনও খেয়াল করিনি। ছোটবেলা থেকে বড়-ছোট, কচি-বুড়ি কত মেয়েকেই তো কাঁদতে শুনেছি।

তিতিরের দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে, ইংরিজিতে যাকে বলে 'রাইজিং টু দ্যা অকেশান'—আমি ওর পনি-টেইলে এক টান লাগিয়ে বললাম, "ইটস্ ওল ইন দ্যা গেম, বেইবি।"

মনে মনে বললাম, সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে ফুচকা অথবা পার্ক স্ট্রিটে কোয়ালিটির আইসক্রিম, নয়তো পিজ্জা-হাটে পিজ্জা খেলেই তো

পারছে খুকি ! আফ্রিকার জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চারে আসা কেন ?

মুখে যাই-ই বলি আর মনে মনে যাই-ই ভাবি, তিতিরকে কাঁদতে দেখে এই প্রথম বুঝলাম যে, মেয়েটা মানুষ ভাল। যেসব মানুষ দুঃখ হলে কাঁদে না, অথবা অভিভূত হলে তা প্রকাশ করে না, আমি তাদের সহ্য করতে পারি না। মন মনে বললাম, ভয় কী তিতির ? আমি তো আছি ! মিস্টার কুল রায়চৌধুরী, রাইট হ্যাণ্ড অব গ্রেট ঋজু বোস—

"কী ভাবছিস রে কল্প ?" ঋজুদা বলল, ঠিক সেই মুহূর্তে।

চমকে উঠে বললাম, "কে ? আমি ? এই-ই, কী ভাবব, তাই-ই ভাবছি ?"

"ফাইন। এখন কী ভাববে তা না-ভেবে, গাড়িটা স্টার্ট করো।"

এই সেরেছে। হঠাৎ গাড়ির উইণ্ডস্ক্রিনে একটা মাছির ডানার ঝুঁ-ঝুঁ-ঝুঁই-ই-ই আওয়াজ শুনে আমার পিলে একেবারে চমকে গেল।

ঋজুদা বলল, "কী হল ? এত কামড় খেয়েও তাদের চিনলি না ? এ তোর সেৎসি নয়। এ একটি বিষ্ণুক নীল মাছি।"

"কাঁটালে মাছি।" তিতির বলল।

কথা ফুটেছে !

"রাইট।" ঋজুদা বলল। "মাইনাস্ কাঁটাল।"

গাড়িটা স্টার্ট করে ব্যাক করে নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম।

তিতির বলল, "আচ্ছা ঋজুকাকা, গুম গুম গুম করে অতক্ষণ ধরে তোমার মুখে দু'হাত দিয়ে থুতু মাখিয়ে তোমাকে কী বলল নাইরোবি-সর্দার ? কিসের মন্ত্র ওসব ? তুকতাক করল না তো ?"

ঋজুদা অন্যমনস্ক ছিল তখনও। পাইপটা ধরাতে ধরাতে বলল, "ওঃ। ও একটা মাসাই প্রবচন। মাসাই যোদ্ধারা যখন যুদ্ধে যায় তখন ওরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করে।"

"কী মন্ত্র ? বলা না ঋজুকাকা ?" তিতির পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

কিন্তু ঋজুদা চুপ করেই রইল। মাঝে মাঝে এমন শক্ত-খোলার কচ্ছপের মুখের মতো নিজেকে গুটিয়ে নেয় এক দুর্ভেদ্য বর্মের আড়ালে। তখন এ-মানুষটাকে যে এত ভাল করে আর এত বছর ধরে চিনি এ-কথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়।

তিতির আহত হল। ঋজুদার নীরবতায়।

অনেকখানি পথ চলে এসেছি ততক্ষণে আমরা। টিকিয়া-উড়ান চালাচ্ছি একেবারে।

"যেমন চালাচ্ছিস, তাতে প্রাণে যদি বেঁচে থাকি তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মিকুউনির পিচরাস্তাতে এসে পড়ব মনে হচ্ছে।" ঋজুদা বলল।

তিতির বলল, "যদি বাঁচি প্রাণে।" বলেই বলল, "নাইরোবি-সর্দারের মন্ত্রর মানেটা বলবে না তাহলে ঋজুকাকা ?"

ঋজুদা একগাল ধোঁওয়া ছেড়ে বলল, "দ্যাখ দ্যাখ, পশ্চিমের আকাশের রঙটা কেমন হয়েছে। আঃ।"

আমরা তিনজনেই মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

তিতির বলল, "বলবে না তুমি ? বলো-না।"

ঋজুদা হঠাৎ তিতিরের দিকে ঘুরে বলল, "মাসাইরা যে-ভাষায় কথা বলে, তার নাম হচ্ছে 'মাআ'। ভাষার নাম থেকেই তাদের উপজাতির নাম হয়েছে মাসাই। যুদ্ধে যাওয়ার সময় ওরা যা বলে, সেই কথাই বলছিল নাইরোবি-সর্দার আমাকে।"

"ওরা কী বলে ?"

"ওরা বলে :

"মোটোনীই আই মোটোনীই আই এ এনগাই
মারিয়ামারি ইলটাটুয়া লেকেরি ওলোঙ্গোনি
এলেমানানু এটারাকি নাথারিশো
নেমিতা কাটা আকৈই এ মোটোনীই আই এনগাই
নিমেরা এলেকিরি।"

তিতির বলল, "মারিয়ামারি কথাটা অবশ্য বাঙলাতে 'মেরে মরব' গোছের কোনো একটা কথার কাছাকাছি যায়। কিন্তু পুরো প্রবচনটার মানে কী ?"

"মাআ ভাষার মর্মোদ্ধার করতে তো বাবা-বাবা ডাক ছাড়তে হবে ঋজুদা।" একটা গর্ত বাঁচাতে, স্টিয়ারিং কাটাতে কাটাতে আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, "দারুণ মানে রে, দারুণ মানে। একটা মস্ত জাত, অতি-বড় যোদ্ধার জাত, পুরুষের জাত, খুড়ি তিতির, সাহসীর জাতই

কেবল এমন মন্ত্র বলে তাদের ছেলেদের যুদ্ধে পাঠাতে পারে। যুদ্ধে বেরুবার আগে যোদ্ধারা নিজেরাও যে এমন কথা আবৃত্তি করতে পারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ভাবলেও অবাক লাগে।"

"আঃ, মানেটা কী?"

"মানে হচ্ছে, 'ভগবান, আমার শিকারি-পাখি তুমি! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকো এই যুদ্ধে। থেকো, এই কারণে যে, আমি জানি না এই যুদ্ধে মরব না মারব। আমি নিজেও মরতে পারি, মরতে পারে শত্রুও। তবু, তুমি সঙ্গে থেকো সবসময়। আমি মরলে, তুমি আমাকে ঠুকরে খেও। আর শত্রু মরলে, শত্রুকে। তোমার খাদ্যের অভাব হবে না কখনও। যুদ্ধ যখন হবে, তখন এসপার-ওসপার তো হবেই। যুদ্ধ মানেই এক পক্ষের জিত আর অন্য পক্ষের হার। যুদ্ধের মর্যাদা তো যুদ্ধেরই মধ্যে। কে জেতে আর কে হারে তাতে কী-ই বা আসে যায়? এসো পাখি, আমার মাংসভুক পাখি, আমার মাথার উপর উড়তে উড়তে এসো। আমার পথের উপর কম্পমান ছায়া ফেলতে ফেলতে'।"

"খাইছে! কও কী ঋজুদা? এ তো সেই সাংঘাতিক পরবচন। এমন পক্ষীর প্রেয়োজন নাই আমাগো। আমরা ভুসুণ্ডার লাশ ফেলাইব। আমাগো—"

"উঃ! বাবা রে!" তিতির চেঁচিয়ে উঠল।

"আঃ। কী হচ্ছে কী, রুদ্র!" ঋজুদা ধমকে বলল। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটার লাশকে একটা কিং-সাইজ গাড্ডা থেকে তুলে ফেলেছি আমি। যা রাস্তা, তার আমি কী করব! সামনেই মিকুউনির পিচের পথ। কটা দোকান। খালি কলার কাঁদি আর অন্যান্য ফল। দেখে মনে হয় কাছাকাছি চিড়িয়াখানা আছে। এত এত বিচিওয়ালা সিঁদুরে-কলা মানুষে খায় কী করে ভগবানই জানেন।

পিচরাস্তায় পৌঁছে গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে তিতিরকে বললাম, "নাও, এবার তুমি চালাও। মাখমের মতো পথ, একেবারে আরুশা অবধি। ড্রাইভিং সিটে বসলে ঝাঁকুনিও লাগবে সবচেয়ে কম।"

তিতির এসে বসল। গাড়ি স্টার্ট করে তিতির বলল, "পরন্তু আমরা এখান থেকে কোথায় যাব ঋজুকাকা? আমার এই সব পাঁয়তারা আর

ভাল লাগছে না। এই বিটিং 'রাউন্ড দ্য বুশ'। আসল জায়গায় কখন গিয়ে পৌঁছব?"

"এটা কি নকল জায়গা?"

ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম আমি।

"জানবে মাদাম্। সময় হলে সবই জানবে। পেশেন্স, প্রেটি গার্ল, উ মাস্ট হ্যাভ প্লেন্টি অব পেশেন্স ইফ উ ডু নট ওয়ান্ট টু বি বেরিড ইন দ্য উইলডারনেস্ অব আফ্রিকা।"

"ভুসুণ্ডা এবং ওয়ানাবেরি এখনও কি আরুশাতেই আছে? ওরা দুজনে কি একই দলের? তিতির একটুও না-দমে আবার জিজ্ঞেস করল।

"বলো লেফটেন্যান্ট।" ঋজুদা আমাকে উদ্দেশ করে বলল।

"আমার মনে হয় ভুসুণ্ডা তোমার ভুজুংটা খেয়েছে। সে এতক্ষণ জাঞ্জিবারে মসলা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমাদের মসলা-বাটার সুযোগ দিয়ে। ভুসুণ্ডাকে বাদ্মার ভার কিন্তু আমার। আমারই একার। প্রথমে আমারও মনে হয়েছিল যে, ওয়ানাবেরি আর ভুসুণ্ডা একই দলের লোক। কিন্তু—"

"একই দলের লোক হলে মাউন্ট-মেরু হোটেলের রিসেপশানে তারা একে অন্যকে দেখেও চিনল না কেন?"

"সেটা তো স্টান্টও হতে পারে। লোক দেখাবার জন্যে।" ঋজুদা বলল।

"হ্যাঁ। তা-ও হতে পারে।" তিতির আর আমি একই সঙ্গে বললাম।

"কিন্তু যে-লোকটা মরল, সে-লোকটা কে?"

"সেই তো হচ্ছে কথা।"

ঋজুদা বলল, মুখ নিচু করে।

বললাম, "এই তো সবে মরামরির শুরু। এরপর তো কড়াক-পিঙ্ আর চিক-চুঁই, জুইক-জুইক।"

"ওয়ানাবেরি! ওয়ানাবেরি আমাদের যে গল্পটা বলতে গিয়েও শেষ করেনি সেদিন, তুমি তার বাকিটা জানো? জানলে বলো না ঋজুকাকা!" তিতির বায়না ধরে বলল।

"মৃত্যুর গল্প মৃত্যু নিজে এসেই বলবে আবার। মৃত্যু একবার পিছু নিলে কি সহজে ছাড়ে? প্রথমটা যার কাছ থেকে শুনেছিস, তার কাছ থেকে

শেষটাও শুনে নিস। তোরা না চাইলেও সে তোদের অত সহজে ছাড়বে না। সবসময় মাসাইদের শিকারি পাখিরই মতো তোদের পথে পথে তার কালো ছায়া ফেলে ফেলে অনুসরণ করবে সে। ওয়ানাবেরি। ওয়ানাকিরি।"

গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিল তিতির। সোজা রাস্তা দেখা যাচ্ছে মাইলের পর মাইল। হেডলাইটের আলো আর কতটুকু পথ আলোকিত করে? দু'পাশে বড় জঙ্গল নেই। ঝোপঝাড়, ঝাঁটি-জঙ্গল, ঘাসবন, উঁচু-নিচু চড়াইয়ে-উতরাইয়ে পথ। গাড়ির মধ্যে শুধু ড্যাসবোর্ডের নীল আলোর আভা ও ডিপারের সবুজ ইণ্ডিকেটরের আলোটুকু। হু-হু করে পিচ কামড়ে গাড়ি চলেছে। সকলেই চুপ।

মাঝে-মাঝে এমনই হয়। যখন প্রত্যেককেই ভাবনাতে পায়। অথচ, ভাবনার চাদরগুলোর মাপ, রঙ সবই আলাদা-আলাদা। রকম সব বিভিন্ন।

আধঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ ঋজুদা তিতিরের স্টিয়ারিং-ধরা হাতে হাত ছুঁইয়ে গাড়ি থামাতে বলল।

খুব জোরে ব্রেক করে দাঁড় করাল গাড়িটাকে তিতির। আমি ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠে চারধারে চেয়ে দেখলাম কেউ নেই, কিছুই নেই।

"কী হল?"

ঋজুদা নিচুগ্রাপ গলায় বলল, "হয়নি কিছুই। আয়। একটু চুপ করে বসে থাকি অন্ধকারে। আফ্রিকার রাতের গায়ের গন্ধ তিতিরকে দিবি না একটু? আফ্রিকা যে সবে চান করে, নতুন শাড়ি পরে, গন্ধ মেখে অসীম আকাশের নীচে অন্ধকারের কালো আঁচল মেলে দাঁড়িয়ে আছে তারাদের আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে, আমাদেরই জন্যে। তার কী বলার আছে তিতিরকে শোনাবি না একটু? কী করে জঙ্গলের সঙ্গে কথা-না-বলে কথা বলতে হয়, তিতিরকে শিখিয়ে দে। তোর কাছে অনেক শিখবে তিতির।"

তিতির চুপ করে তাকাল আমার দিকে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে। আমি আমার নিজের ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ওকে চুপ করে থাকতে বললাম।

যেমন জঙ্গলে গেলেই হয়, সে পৃথিবীর যে-জঙ্গলই হোক না কেন, আস্তে আস্তে জলের মতো, ফুলের গন্ধের মতো, ভোরের হাওয়ার মতো

এক নিটোল, গভীর সুখের মিশ্র-শব্দ-মেশা ঘ্রাণে আমাদের প্রাণের গ্রাল ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎই মনে হল, আমাদের গাড়িতে শুধু আমরা তিনজনই নেই। এই আদিগন্ত বাদামি আফ্রিকার এক কৃষ্ণপক্ষের নিভৃত রাত তার অস্তিত্বকে আমাদেরই মাপের মতো ছোট্ট করে নিয়ে আমাদেরই মাঝের সিট উঠে এসেছে। আমি স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছি, তার নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তার গন্ধ পাচ্ছি। আমি জানি, ঋজুদাও জানে যে, আমরা মিথ্যা ভাবছি না, বা মিথ্যা বলছি না। তিতির যেদিন আমাদের এই অনুভূতির শরিক হতে পারবে, সেদিন তাকে আর শেখাবার কিছুই থাকবে না এই বুনো-জীবন সম্বন্ধে। তিতির শুধু সেদিনই জানবে যে, অনেক বই পড়ে, অনেক রাইফেল ছুঁড়ে, অনেক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়েও সমস্ত জানা যায় না। বাকি থাকে কিছু। যা বাকি থাকে, তা কেউই শেখাতে পারে না কাউকে; তা কোনো বইয়ে লেখা থাকে না, সব য়ুনিভার্সিটির হেড-অব-দা-ডিপার্টমেন্টদের পাণ্ডিত্যেরও বাইরে সেই সহজ অথচ দেবদুর্লভ বিদ্যা। সে-বিদ্যা, সে-জানা অনুভবের, হৃদয়ের। যদি তিতিরের হৃদয় বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেও আমাদের একজন নিশ্চয়ই হয়ে উঠবে। যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে।

যেখানে আজ নাইরোবি-সর্দার, ওয়াটসন আর জেনকিনসের সঙ্গে দেখা হল, পরশু আমরা আরুশা থেকে মিকুউনি গিয়ে লেক মানিয়ারার পথে, সেখান থেকেই প্লেনে চলে যাব। কোথায় যাব, তা এখনও অজানা। আন্দাজ করতে পারছি, হয় ডোডোমা, নয় তো সোজা ইরিঙ্গা। দেখা যাক, তরী গিয়ে কোন্ কূলে ঠেকে!

আজও ঋজুদা জিজ্ঞেস করেছিল আমাদের, ঐ নোটগুলো পড়ে ফেলেছি কি না? আমার এখনও বাকি আছে। তিতিরেরও সামান্য বাকি।

ঋজুদা বলেছিল, ম্যাপ একেবারে মুখস্থ করে ফেলবি। যেন রাতের অন্ধকারেও কম্পাস দেখে পথ চিনতে অসুবিধে না হয়।

চান-টান করে নিজের খাটে শুয়ে আবার কাগজগুলো বের করলাম। ম্যাপটাও। জেনে খুব দুঃখ হল যে, পুব আফ্রিকার পোচিং, এবং পোচিং-করা জানোয়ারদের চামড়া, খড়্গের গুঁড়ো, দাঁত, শিং সব পাচার করার মূলে আছে এশিয়ানরা। পুব আফ্রিকাতে এশিয়ান বলতে ভারতীয়,

পাকিস্তানি, সিয়েলোনিজ, বাংলাদেশী সকলকেই বোঝায়। কিন্তু অঞ্জুলা বলেছিল, এদের বেশির ভাগই ভারতীয় পাসপোর্ট-হোল্ডার নয়। প্রায় সকলেরই ব্রিটিশ পাসপোর্ট। এবং অধিকাংশই পশ্চিম ভারতীয়, গুজরাটি। এদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁরা কখনও ভারতবর্ষ দেখেননি পর্যন্ত। পড়াশুনা করেছেন ইংল্যান্ডে, ছুটি কাটাতে যান সুইটজারল্যান্ডে, এমনি সব 'এশিয়ানস্।'

পোচিং-এর সিংহভাগই হয় সোমালি এবং নানা জাতের যুথবদ্ধ গুণ্ডাদের দ্বারা। যাদের মায়া-দয়া বলতে কিছুই নেই। সব রকম অস্ত্রশস্ত্রই যাদের কাছে আছে। এরা গভীর জঙ্গল অথবা দূর গাঁয়ের এশিয়ানস্ ও আফ্রিকান দোকানদারদের চোরা-শিকারের জিনিস দিয়ে তাদের সঙ্গে গুলি, খাবার এবং টাকা বিনিময় করে। এই সব দোকানদারের কাছে বেশ ভালরকম চোরা-শিকারের সামগ্রী জমে উঠলে, ধরা যাক কয়েকশো কিলোগ্রাম হাতির দাঁত, ট্রাক ভাড়া করে সেই সব জিনিস পাচার করে ভারত মহাসাগরের তীরে। না, অবশ্যই কোনো বন্দরে নয়। ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে, সুন্দরবনে যেমন ম্যানগ্রোভ ফরেস্টস্ আছে, স্টিমার লুকিয়ে নোঙর করে থাকে। সেই স্টিমারে ওঠে সেই সব শিকার করা জিনিস। সেখান থেকে হাতির দাঁত আর নানা জাতীয় হরিণ ও অ্যান্টিলোপের শিং স্টিমারে করে চালান যায় আবু ধাবি এবং দুবাইয়ে শেখদের প্রাসাদ অলংকৃত করতে। আবার সেখান থেকে একাংশ প্লেনে করে চালান যায় পুবে এবং ইয়োরোপে।

আফ্রিকার হাতির দাঁতের বড় একটা অংশ যায় চোরা-শিকারের বড় বড় বিত্তবান কারবারিদের কাছে, ইয়োরোপে, উত্তর আমেরিকাতে এবং ফার-ইস্টে। সেই সব ব্যবসায়ী এই হাতির দাঁত মজুত করে, সোনা অথবা স্টক মার্কেটের লগ্নির বিকল্প হিসেবে। সোনা অথবা শেয়ার-টেয়ারের দাম হঠাৎ-হঠাৎ পড়ে যায়, তাদের মূল্য উবে যায়; কিন্তু যত দিন যাবে হাতির দাঁতের দাম ততই বাড়বে। সেই অর্থে মজুতদাররা হাতির দাঁতকে সোনা, শেয়ার, ডিবেঞ্চারের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান বলে মনে করে। সমস্ত পৃথিবীতে বড় বড় কোটিপতি মজুতদাররা হাতির দাঁত এমন পরিমাণে মজুত করছে যে, যা তাদের গুদামে আছে তার মাত্র শতকরা পনেরো ভাগ

কারুকার্য বা শৌখিন গয়না বা ফার্নিচার বানাবার জন্যে বাজারে ছাড়ে তারা প্রতি বছর। এসব তথ্য ঋজুদার বানানো নয়। অনেক পড়াশুনো করে এই সমস্ত তথ্যের প্রমাণ-সাবুদ হাতে নিয়েই নোটটা বানিয়েছে।

কেনিয়ার একজন ভূতত্ত্ববিদ, এসমণ্ড ব্রাডলি মার্টিন, আফ্রিকান গণ্ডারদের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা ও পড়াশুনা করেছেন। যেমন করেছেন ডগলাস-হ্যামিল্টন হাতিদের নিয়ে। তিনি বলেন যে, এখনও ফার-ইস্টের বিভিন্ন জায়গায় নানারকম রোগের ওষুধ হিসেবে গণ্ডারের খড়্গের বিশেষ চাহিদা। হাকিমি দাওয়াই তৈরি হয় এ থেকে নানারকম। মাথা-ধরা, জ্বর, হৃদরোগ, পিলে-রোগ সব নাকি ভাল হয়ে যায়। 'হাড্ডি-পিলপিলা' রোগও নিশ্চয়ই সারে। যে সব রোগ হয়, কিন্তু রোগীরা "ঠনেতিও পারে না" সে সব রোগও নির্ঘাত সারে! কে জানে? গণ্ডারই হয়তো একমাত্র জানে তার খড়্গের গুণের কথা। এক চামচ খড়্গ চেঁচে নিয়ে গুঁড়ো করলেই ছাই-ছাই ধুধুরঙের একরকম গুঁড়ো হয়। ফুটন্ত জলের সঙ্গে সেই গুঁড়ো মিশিয়ে একরকমের ক্বাথ তৈরি করে বড় বড় হাকিমরা রোগীকে খাইয়ে দেয়। একেবারে দাওয়া অব্দর; রোগ বাহার। শরীরে ওষুধ ঢোকে, আর রোগও সঙ্গে-সঙ্গে বাব্বা মাম্মা ডাক ছাড়তে ছাড়তে পালায়। যে-রোগই হোক না কেন!

কিন্তু আশ্চর্য হলাম পড়ে যে, গণ্ডারের খড়্গের সবচেয়ে বেশি চাহিদা উত্তর ইয়েমেন-এ। ইয়েমেনিরা একরকম লম্বা তরোয়াল ব্যবহার করে। তাদের বলে "জাম্বিয়া"। সেই জাম্বিয়ার হাতল তৈরি করে তারা গণ্ডারের খড়্গ দিয়ে। ইদানীং ইয়েমেনি শ্রমিকরা অ্যারাবিয়ান গাল্ফ-এ চাকরি করে এখন এক-একজন বিরাট বড়লোক। তাই পয়সার অভাব নেই। ঋজুদার নোটটা পড়েশুনে মনে হচ্ছে, একটা গণ্ডার হয়ে জন্মালেও মন্দ হত না। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করে থাকি বলে আমাদের বদনাম আছে। কিন্তু নিজের নাকটি কেটে পরের হাতে তুলে দিয়ে বাকি জীবন যদি অতি সচ্ছল অবস্থায় কাটানো যেত, তবে নাক-কাটার মতো সুখকর ব্যাপার বোধহয় আর কিছুই হত না।

আজকের মুদ্রাস্ফীতির বাজারে গণ্ডারের খড়্গের এক কিলোর যা দাম, তা একজন জঙ্গলের ও গ্রামের পুব আফ্রিকান অধিবাসীর দু বছরের

রোজগারের সমান। দশ কিলো হাতির দাঁতের যা দাম, তা তাদের তিন বছরের রোজগারের সমান। তাই গরিব লোকগুলোকে এই পথে ভুলিয়ে নিয়ে আসতে বড় বড় রুই-কাতলা ব্যবসাদারদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। বন-সংরক্ষণ, ইকোলজি, পরিবেশতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে একজন গড়পড়তা ভারতীয় যতখানি জ্ঞানহীন, আফ্রিকানরাও তাই। তাই ভারতেও যা ঘটছে, ও দেশেও তাই। তবে আফ্রিকা ভারতের চেয়ে অনেক বড় ও অনেক ছড়ানো দেশ বলে এবং জনসংখ্যার চাপ সেখানে কম বলে ও-দেশের ব্যাপার ঘটছে অনেক বড় মাপে।

Convention on International Tradein Endangered Species (CITES) সই হয়েছে উনিশশো তিয়াত্তর সনে। ওয়াশিংটনে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে। চোরা-শিকারের সামগ্রীর আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করার জন্যে। আমদানি যারা করে সেই সব দেশ এই চুক্তি মেনে নিয়েছে, কিন্তু সাব-সাহারা কন্টিনেন্টাল আফ্রিকান দেশগুলোর পঁয়তাল্লিশটির মধ্যে মাত্র পনেরোটি দেশ এই চুক্তি মেনেছে বাকিরা মানেনি। ফলে, জায়ের এবং তানজানিয়াতে চোরা শিকার করা হাতির দাঁত বুরুণ্ডি থেকে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে যাচ্ছে। ব্রাসেলস থেকে আবার রপ্তানি করার পারমিট নিয়ে যেখানে খুশি তা চালান করা হচ্ছে। রপ্তানির কাগজপত্র জালও করা হয় ঘুষঘাষ দিয়ে। অতএব ঋজুদা সব জেনেশুনেও জ্ঞানপাপীর মতো নিজের দেশ ছেড়ে এখানে এই এত বড় জোট-বাঁধা পৃথিবীব্যাপী চক্রের সঙ্গে লড়ে নিজে মরতে আর আমাদেরও মারতে কেন নিয়ে এল, তা একমাত্র সে-ই জানে।

আমি ভেবেছিলাম, ভুষুণ্ডা ভার্সাস কদ্রব এক রাউণ্ড ঢিসুম-ঢিসুম ঢিক-চুই হয়ে যাবে। অ্যামেরিকান ওয়েস্টার্ন ছবির মতো। পরীক্ষা হবে, হু ক্যান ড্র ফার্স্ট? ভুষুণ্ডার হাত তার কোমরে পৌঁছবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ঢিক-চুই করে তার কলমছাঁটি চুলের তেলতেলে পোড়া-কপাল ভেদ করে থাড় শব্দ করে পেছনের গাছে গিয়ে গেঁথে যাবে। নাঃ। একেবারে অকারণে ঋজুদা একটা সহজ-সরল ব্যাপারকে এরকম ভয়ঙ্কর ও জটিল অপারেশন করে তুলল।

ফোনটা বাজল।

রিসিভার তুলতেই, ঋজুদার গলা।

"কী করেন বাহে?"

এবার আবার পুব বাংলার ভাষা ছেড়ে উত্তর বাংলায় চলে গেছে। আমাকে বোকা পেয়েছে, ভেবেছে জবাব পাবে না?

বললাম, "না করি কোনো।"

ঋজুদা হাসল। চমৎকৃত হয়ে। "বাঃ। অ্যাই তো চাই! কিপ্ ইট আপ। তোমার কমরেডের অবস্থা তো খারাপ। খুবই খারাপ। সে খোঁজ রাখো?"

"কেন?"

"থুতুতে নাকি ইনফেকশান ছিল। ওর মুখ নাকি ফুলতে ফুলতে লাল হয়ে গেছে। মুখখানা একেবারে সাঁতরাগাছির ওলের মতো করে আয়নার সামনে বসে আছে সে।"

"শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো নুনের সঙ্গে বেটে লাগাতে বলো। ভাল হয়ে যাবে। আমার কথা তো শুনলে না তুমি। আমার ঠাকুমা বলতেন, পথি নারী বিবর্জিতা।"

"এই এক টপিক্ আর নয়। আর্মিতে বলে যে, ভাল সৈন্য খারাপ সৈন্যের উপর যুদ্ধ-জেতা নির্ভর করে না। ইটস্ দ্য জেনারেল। জেনারেল যেমন, তেমনই হয় তার সৈন্যরা।"

"কে জেনারেল?"

"বাঃ। জেনারেল জন এলেন, ভিক্টোরিয়া ক্রস, ও-বি-ই, অর্ডার অব মেরিট—এটসেটরা, এটসেটরা। জেনারেল, গুড নাইট স্যার। শাট ইওরসেল্ফ ইন ইওর রুম। ডোন্ট মুভ আউট। দরওয়াজা বন্ধ না করো, কোই আউন্দা হোয়েগা। তুসসি ইনে অথে কিউঁ হো?"

হাসলাম। বললাম, "সর্দার গুরিন্দার সিং, ডরিয়া কি বান্দা?"

ঋজুদা হো হো করে হাসতে হাসতে রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল।

"যত হাসি, তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা।" আবার ঠাকুমার কথা মনে পড়ল আমার। সত্যি! এত হাসি ঋজুদার আসে কোত্থেকে?

॥ ৬ ॥

পরদিন আমি আর তিতির হোটেল থেকে আর বেরোলাম না। ঋজুদার কথামতো বসে বসে ভাল করে তানজানিয়া এবং বিশেষ করে রুআহা ন্যাশনাল পার্কের ম্যাপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম।

ঋজুদা ব্রেকফাস্টের পরই বেরিয়ে গেছিল। এল প্রায় রাত সাড়ে নটার সময়। বলল, কাল ব্রেকফাস্টের পর আমরা রওয়ানা হব। কিন্তু হোটেল থেকে চেক-আউট করব না। যাতে কেউ না বুঝতে পারে যে আরুশা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

কাল থেকেই আমাদের অভিযানের প্রথম পর্ব শুরু হবে—এই ভাবনায় রোমাঞ্চিত হয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠে তৈরি হয়ে নিয়ে, যার যার ঘরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আগে তিতির, তারপর ঋজুদা এবং সবশেষে আমি পনেরো মিনিটের ব্যবধানে হোটেল ছেড়ে বাইরে এলাম, যেন বেড়াতে বেরুচ্ছি বা শপিং-এ যাচ্ছি। তানজানিয়ান মিরশ্যাম কোম্পানির সামনে আমরা আলাদা আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছবার মিনিট দশেক পরেই ঋজুদা আজ একটা সাদা-রঙা ভোকসওয়াগন কম্বি গাড়ি নিজে চালিয়ে এল। আমরা খদ্দের সেজে দোকানের ভিতরে মিরশ্যামের পাইপ, অ্যাশ-ট্রে ইত্যাদি নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। তিতির সত্যি খদ্দের হয়ে গিয়ে একটা মিরশ্যামের পাইপ কিনল ঋজুদার জন্য। আর-একটা ওর বাবার জন্য। বাইরে ঋজুদাকে দেখতে পেয়েই আমরা দাম-টাম মিটিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। আবার মিকুউনির রাস্তায়। মিকুউনির মোড়ে যখন পৌঁছেছি এবং মোড় ছেড়ে ডান দিকের কাঁচা রাস্তায় ঢুকব তখন ঋজুদা বলল, "একটু পরেই একটা ব্যাপার ঘটবে, তোরা চমকে যাস না যেন!"

গাড়ি ঋজুদাই চালাচ্ছিল।

কাঁচা রাস্তায় কিছুদূর যেতেই দেখি পথের পাশে একটা কাটা-গাছের গুঁড়িতে বসে ওয়ানাবেরি সিগারেট টানছে, পরম নিশ্চিন্তিতে।

তিতির বলল, "কদ্দ, দ্যাখো।"

আমি আগেই দেখেছিলাম। ব্যাটার কোমরের কাছে বুশশার্টের নীচটা

ফুলে ছিল। যন্ত্র বাঁধা আছে, সন্দেহ নেই। আমিও কোমরে হাত দিলাম। তিতির উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠায় ঠোঁট দিয়ে অদ্ভুত একরকম চুঃ চুঃ শব্দ করতে লাগল। গ্রামের লোক হাঁসকে ধান দিয়ে যেভাবে ডাকে, তেমন করে। ওয়ানাবেরির দিকেই তাকাব না তিতিরের দিকে, বুঝে উঠতে পারলাম না।

ঋজুদা তিতিরকে বাঁ দিকের পেছনের দরজাটা খুলতে বলে ওয়ানাবেরিকে বলল, জুউ হাপা। কারিবু!"

তিতির ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকল। ওয়ানাবেরি এসে তিতিরের পাশে বসে বলল, "জাম্বো!"

আমরা বললাম, "সিজাম্বো।"

ঋজুদা ইংরেজিতে বলল, "তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। এ আমাদের বন্ধু। এর নাম ডামু। ডামু মানে, তিতির হয়তো জানে; রক্ত। সোয়াহিলিতে।"

তিতির বলল, "ওর নাম তো ওয়ানাবেরি।"

ওয়ানাবেরি হাসল। বলল, "ওয়ানাবেরি। ওয়ানাকিরি।"

যেখানে পরশু আমরা প্লেনের জন্য থেমেছিলাম এবং লাঞ্চ খেয়েছিলাম, সে জায়গাটা এখনও দূরে আছে। তিতির বলল, "তোমার গল্পটা কিন্তু সেদিন পুরো বলনি আমাদের। আজকে বলো।"

ওয়ানাবেরি হাসল।

"তোমার সিগারেটে বড় বদগন্ধ।" তিতির আবার বলল।

"আমার গায়ে যে আরও বেশি গন্ধ। সেজন্যই সিগারেট খেয়ে গায়ের গন্ধ চাপা দিই।"

ঋজুদা, কোনো গাড়ি আমাদের ফলো করছে কিনা দেখে নিয়ে বলল, "তুইই চালা রুদ্র। অনেকক্ষণ চালিয়েছি একটানা। একটু পাইপ খাই ওয়ানাবেরির পাশে বসে। তুই সামনে চলে যা তিতির। তোকে তুই করেই বলব আজ থেকে। যাকে বলে, তুই-তোকারি।"

আমি গিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসলাম। তিতির সামনে এল। আমার পাশে।

ঋজুদা পাইপ ধরিয়ে বলল, "বলো ডামু, তোমার গল্প বলো, শোনাই যাক।"

ওয়ানাবেরি মেঘগর্জনের মতো গলায় শুরু করল, "অনেকদিন আগে, মৃত্যু একটি নাদুসনুদুস মোষের গলায় দড়ি বেঁধে মাঠে-প্রান্তরে হেঁটে যাচ্ছিল। এবং কাকে সে নিয়ে যাবে পরপারে তাই ভাবছিল। একজন খুউব গরিব লোক ছিল সেখানে। তার নাম ছিল বুইবুই। মানে, মাকড়সা।"

"আরেঃ। তুমি যখন হোটেলের শপিং-আর্কেডের পাশ থেকে বেরুলে সেদিন, একটা লোককে বুইবুই বলে ডাকলে না? যে লোকটা গুলি খেয়ে মরল তার নামও কি বুইবুই?" আমি শুধোলাম।

"হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছ। তবে, সে অন্য বুইবুই।

"হাঁটতে হাঁটতে মৃত্যুর সঙ্গে বুইবুই-এর দেখা হল। মৃত্যু বলল, এই মোষটা তুমি নিতে পারো, কিন্তু কেবল একটি শর্তে। শর্তটি হল এই যে, আজ থেকে এক বছর পরে আমি যখন ফিরে আসব তখন যদি তুমি আমার নাম ভুলে যাও তাহলে তখন কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। কোনো ওজর-আপত্তিই চলবে না। বুইবুই কতদিন খেতে পায় না, তার বউ-ছেলেও না-খেয়েই থাকে; তাই সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে গেল। ভাবল, নাম মনে রাখা কী এমন কঠিন ব্যাপার! নাদুসনুদুস মোষকে দড়ি ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে মোষটাকে কেটে কয়েকদিন ধরে জোর ভোজ লাগাল। বুইবুই তার স্ত্রী আর ছেলেকে বলল, তোমাদের একটা গান শেখাচ্ছি। রোজ এই গানটা গাইতে ভুলো না—ওয়ানাবেরি! ওয়ানাকিরি!

তারপর ছ'মাস যব আর ভুট্টা গুঁড়ো করতে করতে, গম থেকে খোসা ঝাড়তে ঝাড়তে, কুয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে, খেতে যব আর বজরার চাষ করতে করতে, মাটি থেকে মিষ্টি আলু খুঁড়তে খুঁড়তে সবসময় ঐ গানটিই গাইতে লাগল বুইবুইয়ের ঘরের মানুষেরা।

"সাত মাসে এসে ওয়ানাবেরি কথাটাই শুধু মনে থাকল তাদের। ওয়ানাকিরি কথাটি ভুলেই গেল।

"আট মাসে সে কথাটিও আর মনে থাকল না। থাকল শুধু সুরটি। আর ন' মাসের মাথায় গান এবং সুর দুই-ই ধুলোর মধ্যে ধুলোর মতোই মিশে গেল। কিন্তু অবশেষে একদিন যেমন সব বছরই শেষ হয়, সেই

বছরও শেষ হল। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যখন শেষ হল, শেষ প্রহরে, শেষ মুহূর্তে কে যেন বুইবুইয়ের ঘরের দরজায় টোকা দিল।

"বুইবুই চেঁচিয়ে বলল, কে রে? কে?

"আমি! মৃত্যু! আমার নাম কি মনে আছে তোমার?

"এক সেকেণ্ড। একটু দাঁড়াও। আমি ভাঁড়ারের মধ্যে তোমার নামটি লুকিয়ে রেখেছি। নিয়ে আসছি এখুনি। একটু সময় দাও। দৌড়ে সে বৌয়ের কাছে গিয়ে বলল, সেই গানটা? গানটা মনে আছে তোমার?

"বৌ বলল, আছে। ডিনডিন—ডিনগুনা।

"বুইবুই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ফিরে এসে বলল, তোমার নাম তো ডিনডিন-ডিনগুনা।

"তাই-ই বুঝি! আমার নাম তাই! চলো আমার সঙ্গে। বলেই, বুইবুইকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলল মৃত্যু। তার বৌ কাঁদতে লাগল। মৃত্যু বুইবুইকে কিছুদূর নিয়ে যাবার পর তার ছেলে পিছন পিছন দৌড়ে এসে একটা গাছে চড়ে তার হাত দুখানি মুখের কাছে জড়ো করে বলল, বাবা, ওয়ানাবেরি! ওয়ানাকিরি! ওয়ানাবেরি! ওয়ানাকিরি!

"ভয়ে আধমরা বুইবুই বিড়বিড় করে উঠল, ওয়ানাবেরি, ওয়ানাকিরি!

"মৃত্যু বুইবুইকে ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল দিগন্তের কুয়াশায়।"

একটু চুপ করে থেকে ডামু বলল, "আসলে সব ভাল ছেলেরাই জানে যে, বাবা মরে গেলে, বাবার ধার তাকেই সব শুধতে হবে। তাই বাবাকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়, ততই ভাল।"

গল্প শেষ করে ডামু আরেকটা সিগারেট ধরাল।

তিতির বলল, "এটা আফ্রিকার কোন উপজাতিদের মিথ? মাসাইদের?"

"না। হসাদের।"

ততক্ষণে আমরা পরশুর জায়গায় পৌঁছে গেছি। গাড়িটা পথ ছেড়ে ভিতরে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখলাম, ঋজুদা যেমন করে রেখেছিল। ঋজুদা ঘড়ি দেখে ট্রাভেলার্স চেকের তাড়া বের করে খসখস করে চেক সই করল। তারপর ডামুকে বলল, "আমরা চলে গেলে তুমি চেকটা ভাঙাবে। গাড়ি ফেরত দেবে না। রাস্তার মধ্যে গাড়ি রেখে গাড়ির মধ্যে গাড়িভাড়ার

টাকা একটা খামে ভরে রেখে দেবে। গাড়িটা এমন জায়গায় রাখবে যে, কার-রেন্টাল কোম্পানির খুঁজে নিতে একটুও অসুবিধা যাতে না হয়। তারপর হোটেলে একটা ফোন করে বলবে যে, আমরা লেক মানিয়ারাতে বেড়াতে গেছি। কাল সন্ধে নাগাদ ফিরে আসব। ঘর ছাড়ছি না কেউই। পরশু দিন ডাকে ওদের টাকা পাঠিয়ে দেবে আরুশা থেকেই। কত বিল হয়েছে ফোনে জেনে নিয়ে। তোমার পরিচয় দেবে না যে, এ-কথা নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই। তারপর কী করতে হবে তা তো সব তোমার জানাই আছে।"

"হ্যাঁ।" ডামু বলল।

"এবার আমাদের নামিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও। প্লেনটা আর গাড়িটা কেউ একসঙ্গে না দেখলেই ভাল। আমরা একটুও দেরি করব না। প্লেন ল্যাণ্ড করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ব এবং সঙ্গে সঙ্গেই রওয়ানা হব।"

ডামু আমাদের 'গুল দ্য বেস্ট' জানিয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম, "একে আবার কোত্থেকে জোটালে ঋজুদা? আরেকজন ভুয়ুণ্ডা হবে না তো এ?"

"আশা করছি, হবে না। এ ছাড়া আর কী বলা যায়? ও এক সময় টর্নাডোর দলে ছিল। এই সবই করত। অনেক মানুষ, এমন কী গেম-ওয়ার্ডেনও খুন করেছে। কিন্তু এ বছরের গোড়াতে ওর স্ত্রী এবং দুটি ছেলেমেয়ে সাত দিনের মধ্যে ইয়ালো-ফিভারে মারা যাওয়াতে ওর মনে হয়েছে ও পাপ করেছে বলেই এমন সর্বনাশ হল। তাই ও পাপক্ষালন করতে চাইছে তাদের পুরো দলটাকে ধরিয়ে দিয়ে। ওদের দলের জাল সারা পৃথিবীতে ছড়ানো। বছরে কয়েক মিলিয়ন ডলারের কারবার করে এরা। বেলজিয়ান, অ্যামেরিকান, আফ্রিকার এশিয়ানস্ এবং অ্যামেরিকান ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে ওদের। ওরা মাল পাঠায় মাফিয়া আইল্যাণ্ডের উল্টোদিকের দরিয়া থেকে স্টিমারে করে সমুদ্রের চোরা পথে এবং কার্গো প্লেনে করে। এত বড় একটা অর্গানাইজেশন যে ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। ওদের দলে শিকারি তো আছেই। তাদের কাছে অটোমেটিক ওয়েপনস্ আছে। আর আছে স্নাইপারস্। যাদের হাতের টিপ অসাধারণ। দূর থেকে, গাছ বা পাহাড়ের আড়াল থেকে টেলিস্কোপিক

লেন্স লাগানো লাইট রাইফেল দিয়ে তারা গেম-ওয়ার্ডেন, অন্য চোরা-শিকারের দলের লোক এবং তাদের শত্রুদের নিধন করে।"

ঋজুদার কথা শেষ হতে না-হতেই দূরাগত প্লেনের এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। দেখতে দেখতে একটি অতিকায় হলুদ পাখির মতো ছোট্ট প্লেনটি এসে নামল। তারপর ট্যাক্সি করে এসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঠেতুলগাছ থেকে কিছুটা দূরে থামল। দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দিল ওয়াটসন। আমরা উঠতেই দরজা বন্ধ করে টেক অফ করল।

ঋজুদা বলল, "ডোডোমাতে কি তেল নেবার দরকার হবে?"

ওয়াটসন বলল, "হবে। তোমাদের জন্য সব বন্দোবস্ত পাকা করা আছে। ডোডোমাতে মিনিট পনেরো-কুড়ি দাঁড়িয়ে চলে যাব ইরিঙ্গা। রাতটা যাতে হোটেলে তোমাদের থাকতে না হয় তারও বন্দোবস্ত করছি। তবে ইরিঙ্গা থেকে অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে একটি মেয়েকে দিয়ে দেব। তিতির তো আছেই সঙ্গে, আর একজন মেয়ে থাকলে তোমাদের দলটাকে দেখে কারো সন্দেহ হবে না। যা সব জিনিসপত্র তোমাদের বইতে হবে, তাতে দুটি ল্যাণ্ডরোভার তোমাদের দরকার। আসলে ইবুণ্ডজিওয়ার ফেরি পেরোবার সময় কুআহা পার্কের গার্ডকেই বলে দিতে পারতাম কিন্তু গার্ডদের মধ্যে অনেকেই টর্নাডোর দলের কাছ থেকে রীতিমত মাস-মাইনে পায়। ঘুষে ঘুষে ছয়লাপ করে রেখেছে। সেই ভয়েই তোমাদের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলিই যেতে হবে এবং অফিসিয়ালি তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করা যাবে না।"

"মেয়েটি ফিরবে কী করে?"

"ওকে তোমরা সেম্বেতে নামিয়ে দেবে। ওখানে দুদিন থেকে ও অন্য একদল ট্যুরিস্টের সঙ্গে ফিরে আসবে। ও সেম্বেতে সকলকে বলবে যে, তোমরা কুআহাতে থাকবে না, জিওগ্রাফিকাল এক্সপিডিশানে এসেছ, রাঙ্গোয়া ন্যাশনাল পার্কে চলে যাবে। সেখান থেকে লেক ট্যাঙ্গানিকা।"

ইরিঙ্গার শহরতলিতে একটি ছোট্ট বাংলোয় রাতটা কাটিয়ে দাঁড়কাকেদেরও ঘুম ভাঙার আগে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আফ্রিকান মেয়েটি আমরা রওয়ানা হবার মিনিট-দশেক আগে আমাদের বাংলোতে এসে পৌঁছল। সে পিকিং-এ (বেজিং) পড়াশুনা করেছে। এখন

সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কের সেরোনারাতে জুওলজি নিয়ে রিসার্চ করছে। ওর গবেষণার বিষয় হচ্ছে উটপাখি। মেয়েটির নাম শাশা। বয়সে আমাদের চেয়ে বছর-দশেকের বড়। মিষ্টি দেখতে। কিন্তু চুলে কাঁচালঙ্কার মতো খুদে খুদে বিনুনি বানিয়েছে। ওই নাকি আফ্রিকান হেয়ার-স্টাইলের চূড়ান্ত। ধনেপাতা যোগাড় করা গেলে কয়েকগাছি কাঁচালঙ্কা কেটে নিয়ে ফুলকপি দিয়ে কই মাছ রান্না করে জম্পেস করে খাওয়া যেত। এখন অনেকদিন এসব খাওয়া-দাওয়া স্বপ্নের ব্যাপার হয়েই রইবে। কী খাব, কোথায় থাকব এবং আমরাই কোনো বন্যপ্রাণী অথবা চোরা-শিকারীদের খাদ্য হব কি না তা ভগবানই জানেন।

ইরিঙ্গা থেকে ইভান্ডি বলে একটা ছোট্ট জায়গায় যখন এসে পৌঁছলাম তখন পুবের আকাশে লালের ছটা লাগল। এখন কলকাতায় হয়তো রাত এগারোটা-বারোটা। একটা কফির দোকান সবে খুলেছিল। কফি খেলাম আমরা এক কাপ করে। অজুদা একটি ল্যাণ্ডরোভার চালাচ্ছে। তিতির অজুদার সঙ্গে। আমার সঙ্গে শাশা। শাশা নানান গল্প করতে করতে চলেছে। ওকে একবার চোরা-শিকারিরা ধরে নিয়ে গেছিল। সাতদিন ওদের খপ্পরে ছিল সে। অনেক অত্যাচারও করেছিল ওরা, তবে প্রাণে মারেনি। কী করে ওদের হাত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিল শাশা, তা নিয়ে একটি দুর্দান্ত বই লেখা যায়। তারপর থেকেই পৃথিবীর তাবৎ চোরা-শিকারীদের উপর জাতক্রোধ জন্মে গেছে শাশার। আমাকে বলছিল, "তোমরা যদি এই চক্র ভাঙতে পারো তাহলে প্রেসিডেন্ট নিয়েরে তোমাদের বিশেষ পুরস্কার দেবেন এবং তানজানিয়ার সমস্ত প্রকৃতিপ্রেমী তোমাদের সংবর্ধনা দেবে। তবে, বড় বিপজ্জনক কাজে যাচ্ছ তোমরা। ভগবান তোমাদের সহায় হোন। আর কিছুই আমার বলার নেই।"

ইরিঙ্গা জায়গাটা পাহাড়ি। উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটের বেশি। ইরিঙ্গা থেকে ক্রমাগত পশ্চিমে চলেছি আমরা। ইভান্ডি ছাড়িয়ে এসে ঝকঝকে আলো-ভরা ভর-সকালে এবারে গ্রেট রুআহা নদীর সামনে এসে পড়লাম। এখানে ফেরি আছে। ইবগুজিয়াতে ফেরি করে আমাদের ল্যাণ্ডরোভারসমেত নদী পেরুলাম আমরা। পেরিয়েই রুআহা ন্যাশনাল পার্কে ঢুকে পড়লাম। ইরিঙ্গা হচ্ছে আফ্রিকান হেহে উপজাতিদের মূল

বাসস্থান। ইরিঙ্গা ছাড়ার পরই আমরা নামতে আরম্ভ করেছিলাম। এই জঙ্গলকে বলে 'মিওম্বো'। ঐ সব অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে চাষ করেছে হেহেরা দেখলাম। নানারকম ফসল করে ওরা শিফ্‌টিং কাল্টিভেশান করে। আমাদের দেশে যেমন জুম চাষ হয় তেমন। মেইজ, সরঘাম, কাসাভা, কলা, নানারকম ডাল, তামাক ইত্যাদির চাষ আছে দেখেছিলাম পথে।

যে-ফেরিতে করে গাড়িসুদ্ধু নদী পেরুলাম আমরা, সেটা খুব মজার। আমাদের দেশেও অনেক জায়গায় ফেরিতে নদী পারাপার করেছি জিপসুদ্ধু, কিন্তু এমন ফেরি কোথাওই দেখিনি। ফেরিটা মাঝিরাই চালায় কিন্তু পাটাতনটা চুয়াল্লিশ গ্যালন তেলের ফাঁকা টিনের উপর বসানো। অদ্ভুত নৌকো। নদী পেরুনোর পর মাইল-চারেক গিয়েই সেন্ধে। রুআহা ন্যাশানাল পার্কের হেড-কোয়ার্টার। নানা জায়গা থেকে পথ এসেছে সেন্ধেতে। এখান থেকে গ্রেট রুআহা আর মাওয়াগুশি এবং এমডনিয়ার উপত্যকায় চলে গেছে সব কাঁচা রাস্তা। গ্রেট রুআহাতে সারা বছরই জল থাকে। কিন্তু এমডনিয়া আর মাওয়াগুশি শীতকালে শুকিয়ে যায়। তখন এ নদী দুটির বুকে জিপ বা ল্যাণ্ডরোভার চালিয়ে ঘোরাফেরা যায়। কখনও কখনও ফোর-হুইল ড্রাইভের জন্যে স্পেশ্যাল গিয়ার চড়াতে হয় বটে কিন্তু সাধারণত দরকার হয় না। এখন আফ্রিকাতে শীতকাল। তাই এই দুই বালি-নদীর মধ্যবর্তী কমব্রেটাম-অ্যাকাসিয়ায় ভরা জঙ্গলের মধ্যে নানা বনপথ আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গেছে এখন সারা জঙ্গলকে কাটাকুটি করে।

বনপথের যে-কোনো মোড়ে এসে দাঁড়ালেই আমার অ্যামেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার সেই লাইনগুলো বার বার মনে পড়ে। অজুদার মুখেই প্রথম শুনি কবিতাটি। অজুদার খুব প্রিয় কবিতা। 'দ্যা রোড নট টেকেন'।

"I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less travelled by,
And that has made all the difference."

যে পথে অনেকে গেছে, মানুষের পায়ে পায়ে আর জিপের চাকার দাগে যে-পথ চিহ্নিত সে-পথে গিয়ে কী লাভ ? যে-পথ কেউ মাড়ায় না, যে-পথে চলতে গেলে পায়ের বা জিপের চাকার নীচে পথ-লুকিয়ে-রাখা শুকনো পাতা মচমচ শব্দ করে পাঁপরভাজার মতো গুঁড়ো হতে থাকে, যে-পথের বাঁকে বাঁকে বিস্ময়, বিপদ এবং কৌতূহল, সেই রকম পথেই তো যেতে হয় । জীবনেও যেমন দশজনের মাড়ানো পথে গিয়ে মজা নেই কোনো, জঙ্গলেও নেই ।

সেস্বেতে শাশা নেমে গেল । এখনও আমরা ছদ্মবেশেই আছি । নিশ্চয়ই ঋজুদার নির্দেশে নিজেদের আসল চেহারায় ফিরে যেতে হবে আমাদের । তবে, কবে, কোথায়, কখন তা ঋজুদাই জানে ।

শাশা নেমে যাবার আগে ওর সঙ্গে সেস্বেতে ব্রেকফাস্ট করলাম আমরা

ঋজুদা বলল, "ভাল করে খেয়ে নে । এর পর কখন খাওয়া জুটবে আজকে তার ঠিক কী ?" ব্রেকফাস্ট সেরে, সেস্বে থেকে বেরিয়ে কিছুটা এসে ঋজুদা গাড়ি থামাল । আমি গাড়ি থেকে নেমে ঋজুদার গাড়ির কাছে গেলাম । ল্যাণ্ডরোভারের বনেটের উপর রুআহা ন্যাশনাল পার্কের ম্যাপটা খুলে মেলে ধরে ভুসভুস্ করে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাল করে ম্যাপটা দেখতে লাগল ঋজুদা । যখনই খুব মনোযোগের সঙ্গে কিছু করে, তখনই ভীষণ গম্ভীর দেখায় ঋজুদাকে । কপালের চামড়া কুঁচকে যায় । তখন দেখলে মনে হয় মানুষটা একেবারেই অচেনা । তিতিরও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল । আমরা তিনজন ঝুঁকে পড়ে ম্যাপটা দেখছিলাম । ঋজুদা পকেট থেকে একটা মোটা হলুদ মার্কার পেন দিয়ে দাগ দিতে লাগল । বলল, "তোদের ম্যাপগুলো বের করে একভাবে দাগ দিয়ে রাখ ।"

ম্যাপ-দাগানো শেষ হলে ঋজুদা স্টিয়ারিং-এ বসল । এবার বড় রাস্তা ছেড়ে একটা প্রায়-অব্যবহৃত পথে ঢুকে পড়ল সামনের ল্যাণ্ডরোভার ।

ভারী চমৎকার লাগছিল । আফ্রিকার কালো মাটি, আকাশ-ছোঁয়া সব বড় বড় তেঁতুলগাছ । অ্যাকাসিয়া অ্যালবিডা । কিন্তু যত গভীরে যেতে লাগলাম ততই জঙ্গলের প্রকৃতি বদলাতে লাগল । তেঁতুল আর অ্যাকাসিয়া অ্যালবিডা, নদীর কাছাকাছি বেশি ছিল । এবার পথটা পাহাড়ে

চড়তে শুরু করল। বুঝলাম, আমরা কিমিবোওয়াটেঙ্গে পাহাড়ের দিকে চলেছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়টা দেখা গেল বাঁ দিকে। দুপুর শেষ হয়-হয় এমন সময় আমরা এমবাগি হয়ে মাওয়াগুশি বালি-নদীর পথ ছেড়ে আরো বাঁ দিকে একটি পথে ঢুকে এসে এমন একটা জায়গায় পৌঁছলাম যে, তার তিনদিকে তিনটি ছোট পাহাড়। সেই সব পাহাড়ের নাম ম্যাপে নেই। পাহাড়ের খোলের ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গলে কিছুক্ষণ এগিয়ে পেছিয়ে মনোমতো একটি জায়গা দেখে ঋজুদা বলল, "আজকের মতো এখানেই ক্যাম্প করা যাক।"

সেই অন্ধকার থাকতে স্টিয়ারিং-এ বসেছি। কোমর টনটন করছিল। যাত্রা শেষ হওয়ায় ভাল লাগল। ল্যাণ্ডরোভার দুটিকে এমনভাবে রাখলাম, যাতে ঐ অব্যবহৃত পথ থেকেও কারো চোখে না পড়ে।

তিতির শুধোল, "এই পাহাড়গুলোর নাম নেই ঋজুকাকা?"

"নাই-ই বা থাকল। দিতে কতক্ষণ? মধ্যের বড় পাহাড়টার নাম রাখা যাক নাইরোবি। আমাদের নাইরোবি-সর্দারের নামে। ডান দিকেরটার নাম টেডি মহম্মদ, আমাদের বন্ধুর নামে, যে গতবারে গুগুনোগুম্বারের দেশের অভিযানে প্রাণ হারিয়েছিল।

"আর তৃতীয়টা? মানে বাঁ দিকেরটা?"

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, "কী নাম দেওয়া যায় জেনারেল?"

বললাম, "নাম দাও তিতির। অসীম সাহসী মেয়ে, বাঙালি মেয়েদের গর্ব তিতিরের নামে।"

"ফাইন্।" ঋজুদা বলল।

তিতির খুব খুশি হল। কিন্তু মুখ লাল করে বলল, "আহা!"

ঋজুদা বলল, "আর সময় নেই সময় নষ্ট করবার। তিতির আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানে। কিন্তু তাঁবু খাটাতে জানে না। তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটিয়ে ফেল। তারপর রাতের খাওয়ার বন্দোবস্ত করলেই হবে।"

আমি আর তিতির ল্যাণ্ডরোভারের পেছন খুলে একটা তাঁবু বের করছি, ঋজুদা বনেটের উপর উঠে বসে পাইপ খাচ্ছে আর চার দিক দেখছে মনোযোগ দিয়ে, এমন সময় হঠাৎ প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করে হাতি ডেকে উঠল

কাছ থেকেই।

ঋজুদা বলল, "খাইছে! এরা আবার কী কয় রে? যার জন্যে চুরি করি, সেই কয় চোর!"

আমি তাঁবু ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি রাইফেল বের করতে গেলাম।

ঋজুদা বলল, "তাঁবু খাটা। রাইফেল, গুলি এবং অন্যান্য সব সরঞ্জাম কোথায় কোন্ গাড়িতে রেখেছে তা সব চাট দেখে মিলিয়ে মিলিয়ে বের করতে হবে। কোনো ভয় নেই। খুদে হাতিয়ার তো যার যার পকেটেই আছে। ওরা বেশি তেড়িমেড়ি করলে দুই একটা গান শুনিয়ে দিস্। তোর বেসুরো গানের এফেক্ট ফোর-সেভেন্টি ফাইভ ডাবল-ব্যারেল রাইফেলের গুলির চেয়েও জোরদার হবে। হাতিরা জানে যে আমরা হাতি মারতে আসিনি, হাতিমারাদের মারতে এসেছি। ওরা তোকে আর তিতিরকে গার্ড অব অনার দিল বৃংহণ করে। কিছুই বুঝিস না কেন?"

তিতিরকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। স্বাভাবিক। এর আগে চিড়িয়াখানায় পোষা হাতির পিঠে চড়ে আইসক্রিম খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। বুনো হাতি এত কাছ থেকে এমন জঙ্গলে প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ বাজাবে তা ওর কাছে একটু উত্তেজনার তো হবেই।

একটা তাঁবু খাটানো হলে ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "অন্যটা কোথায় লাগাব?"

ঋজুদা কী ভাবল। তারপর বলল, "আমার ইচ্ছে আছে, পাহাড়ের কোনো গুহাতে বা পাহাড়ের উপরের কোনো লুকোনো সমতল জায়গায় ডেরা করব। আজ আর বেশি ঝামেলা করিস না। প্রথম রাত। আমি গাড়িতেই থাকব। তোদের পাহারা দেব। তোরা দুজন তাঁবুতে শো। কালকে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে।"

হঠাৎ আমাদের পিছনের ঝোপে খরখর্ সরসর আওয়াজ হল। একই সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম আমরা। তাকাতেই দেখলাম, কী একটা কালো জানোয়ার গোঁয়ারের মতো ঝোপকাড় ভেঙে দুদ্দাড় শব্দ করে দৌড়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে মুহূর্তের মধ্যে।

তিতির একদম চুপ। চলে-যাওয়া জন্তুটার পথের দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিল ও। আবার হাতি ডাকল প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—করে।

আমি বললাম, "ভাল দেখতে পেলাম না। কী ওটা ঋজুদা? ওয়াটহগ?"

"না। সেরেঙ্গেটিতে এই জানোয়ার দেখিসনি। যদিও এদের চেহারাও অনেকটা ওয়াটহগের মতো। তবে এদের ওয়াটগুলো অনেক ছোট। এদের বলে বুশ্-পিগ্। রুআহা ন্যাশানাল পার্কে এদের প্রায়ই দেখতে পাবি। এবারেও যদি আমাদের গাড়ি নিয়ে কেউ চম্পট দেয় বা আমাদের ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় প্রাণ নিয়ে, তাহলে এরাই হবে প্রধান খাদ্য। ছোটখাটো চেহারার একটিকে দেখে ঘাড়ে একটি থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলের বা শটগানের বুলেট ঠুকে দিবি—ধপ্পাস্ করে পড়ে যাবে। ফার্স্ট ক্লাস বার-বি-কিউ হবে। তবে বেজায়গায় গুলি লাগলে এরাও আমাদের দিশি শুয়োরের মতো সাংঘাতিক বেপরোয়া হয়ে যায়। দিশি কি বিদেশী সব শুয়োরের জানই খুব শক্ত, কইমাছের প্রাণের মতো, আর ভীষণ একরোখা হয় এরা। জায়গামতো ধরতে না পারলে চিতা, লেপার্ড এবং সিংহকেও এরা বাবা-কাকার ডাক ছাড়িয়ে ছাড়ে।"

তিতির বলল, "ঋজুকাকু, তুমি যে বলেছিলে, উত্তর বাংলার বামনপোখরিতে আমাদের প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া, মানে লালজির হাতি ধরা ক্যাম্পে নিয়ে যাবে একবার। তা তুমি যখন লালজিকে এত ভাল করে চেনো, ওঁকে বলো না কেন আফ্রিকাতে এসে হাতি ধরতে? এত হাতি এখানে!"

ঋজুদা আমার দিকে তাকাল। বলল, "তিতিরকে বল্।"

আমি বললাম, "জেনে রাখো, আফ্রিকান হাতি কখনও পোষ মানে না। কখনও না। আর চেহারায় ভারতীয় হাতিদের থেকে তারা বহুগুণ বড় হয়। হাতি ধরা হয় পোষা-হাতিদের সাহায্য নিয়ে আমাদের দেশে। এখানকার হাতি পোষই মানে না যখন, তখন হাতি ধরা হবে কী করে? আর যদি খেদা বা অন্য কোনো উপায়েও ধরা হয় তাহলেও একটি হাতিও তো কাজে লাগবে না। বন্দিদশাতে রাখলে ওরা না খেয়ে মরে যাবে তবু ভাল, কিন্তু পোষ কখনোই মানবে না। এই আফ্রিকান হাতিদের মতো স্বাধীনতাপ্রিয় জানোয়ার খুব কম আছে।"

বেলা পড়ে আসছিল। শীতটা বাড়ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার

হয়ে যাবে। তিনদিকের পাহাড় আর পাহাড়তলির জঙ্গল আস্তে আস্তে রাতের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। আমি বললাম, "রাতে খাওয়া-দাওয়ার কী হবে?"

ঋজুদা পকেট থেকে চাঁট বের করে বলল, "তোর গাড়িতে, গোটসাইডে, টিনড্ ফুড আছে। কয়েক ক্রেট মিনারাল ওয়াটারও আছে। যতদিন না আমরা জঙ্গলে জলের পাশে স্থায়ী আস্তানা গাড়ছি, ততদিন মিনারাল ওয়াটারই খেতে হবে জলের বদলে।"

তিতির বলল, "তোমার লিস্টে স্টোভ আছে?"

"আছে।"

"ডাল-ভাল?"

"তাও আছে।"

"ঘি?"

"ঘি?"

চার্টে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমি বললাম, "খাঁটি গব্যঘৃত? ভেবেছটা কী? কিন্তু তোমার জন্যে দেখছি তাও আছে। মাত্র এক টিন। এক কে-জি।"

"ব্যাস্। তাহলে আমি খিচুড়ি বানিয়ে দিচ্ছি তোমাদের।"

"প্রথম রাতেই আগুন জ্বালানো কি ঠিক হবে? আমাদের বন্ধুরা যে ধারে-কাছেই নেই তা তো বলা যায় না? আগুন যদি তারা দেখে ফেলে?"

"ঠিক বলেছিস্।" ঋজুদা বলল।

"নো-প্রবলেম। তাঁবুর মধ্যে, তাঁবুর পর্দা বন্ধ করে রেখে দেব স্টোভ জ্বালিয়ে। তাঁবুটা গরমও হবে তাতে।" তিতির উত্তর দিল।

ঋজুদা বলল, "দ্যাটস্ নট্ আ ব্যাড আইডিয়া। তবে? দ্যাখ, কত! তিতির না এলে তোকে এরকম জায়গায় এই কৃষ্ণ মহাদেশে কেউ মুগের ডালের খিচুড়ি খাওয়াতে পারত?"

"সেটা ঠিক।" বলতেই হল আমায়। আফটার অল্ খিচুড়ি বড় কথা!

প্রথম রাতটা ভালয় ভালয়ই কাটার কথা ছিল। উৎপাতের মধ্যে

একটা হাতির বাচ্চা আমাদের তাঁবুর খুব কাছে চলে এসেছিল। হঠাৎই আবার কী মনে করে ফিরেও গেল।

তিতির যখন তাঁবুর মধ্যেই স্টোভ জ্বালিয়ে খিচুড়ি রাঁধছিল, আর সঙ্গে বেগুন-ভাজা, টিন থেকে বের করে, দারুণ গন্ধও ছেড়েছিল খিচুড়ির, তখন আমি ওর সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম পেঁয়াজ ছাড়াতে ছাড়াতে। পেঁয়াজ ছাড়ানো কি ছেলেদের কাজ! এমন চোখ-জ্বালা করে না!

ঋজুদা পর্দা-ফেলা তাঁবুর বাইরে ল্যান্ডরোভারের বনেটের উপরই গায়ে ফারের কলার-ওয়ালা অলিভ গ্রিন জার্কিন পরে মাথায় বেড়ে টুপি চাপিয়ে আমাদের কথা শুনছিল আর মাঝে মাঝে টুকটাক কথা বলে আমাদের কথায় যোগ দিচ্ছিল।

"এই রুয়াহা ন্যাশানাল পার্কে হিপোপটেমাস্ নেই ঋজুদা?"

ঋজুদাকে শুধোলাম।

"না থাকলেও বা ক্ষতি কী? তুই যে পরিমাণ মোটা হচ্ছিস, জোলো জায়গা দেখে তোকে তাতে ছেড়ে দিলেই তিতিরের হিপো দেখা হয়ে যাবে।"

"না। সিরিয়াসলি। বলো না?"

"এখানে একটা জায়গা আছে, তার নাম ট্রেকিমবোগা। সেখানে প্রায়ই ওদের দেখা যায়। সেখানে আমাদের যেতেও হবে। ট্রেকিমবোগা কথাটার মানে হচ্ছে, হেহে ভাষায়—'মাংস রান্না'। মানেটা বুঝলি তো? চোরা-শিকারিরা ওখানে রীতিমত মৌরসি-পাট্টা গেড়ে বসত আগে। হয়তো এখনও বসে। তাদের ক্যাম্প পড়ত এবং পট-হান্টিং করে তারা সেই মাংস রান্না করে খেত।"

"পট-হান্টিং মানে?" তিতির বলল।

"খাবার জন্য শিকারিরা যতটুকু শিকার করে তাকে পট-হান্টিং বলে। জঙ্গলে তো আর মাংস বা মুরগির দোকান থাকে না। কোনো জঙ্গলেই থাকে না। অবশ্য চোরা-শিকারিরা কি আর শুধুই পট-হান্টিং করত, তারা ম্যাসাকারই করত রীতিমত।"

হঠাৎ তিতির চিৎকার করে উঠল, "মারো, মারো, মারো, রুদ্র! শিগগির মারো।"

কী মারব তা বুঝতে না পেরে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলাম আমি কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে।

তিতির বলল, "আঃ, দেখতে পাচ্ছ না? কী তুমি?"

তিতিরের মারো-মারো রব শুনে ঋজুদাও পর্দা ঠেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। ঢুকেই, চট করে এগিয়ে গিয়ে পায়ের যোধপুরী বুট দিয়ে মাটির সঙ্গে থেঁতলে দিল দুটো কালো বিছেকে। পেল্লায় বিছে। সাধারণত আফ্রিকাতে যে লাল বিছে দেখেছি তাদের চেয়ে সাইজে এরা অনেক বড় এবং লাল মোটেই নয়। কালো। টর্চ ফেলে ভাল করে দেখি, তাঁবুর মধ্যে অসংখ্য গর্ত। ঠিক গোল নয়, কেমন লম্বাটে-লম্বাটে গর্ত।

ঋজুদা নিজের মনেই বলল, পাণ্ডানাস্ বিছে। তারপর বলল, "এদের বিষ কম। কামড়ালে রে মাম্মা, রে বাব্বা করতে হবে বটে, তবে প্রাণে নাও মরতে পারিস। আরো যদি বেরোয় তাহলে না মেরে সটান খিচুড়ির হাঁড়িতে চালান করে দিস তিতির। নয়তো, বেগুনের সঙ্গে ভাজতেও পারিস। ফার্স্ট ক্লাস খেতে। কম্যান্ডো ট্রেনিং-এর সময় একবার আমি খেয়েছিলাম, তবে দেশে। দেশের জিনিসের স্বাদই আলাদা। বিছেও বড় মিষ্টি লেগেছিল। বুঝলি।"

আমরা যখন তাঁবুর মধ্যে খেতে বসেছি তখন তিনজনেই কান খাড়া রেখেছিলাম। যেহেতু ডান হাতের কর্ম করার সময় ডান হাতটি ব্যস্ত থাকবে, যার যার ছোট অস্ত্র কোমর থেকে খুলে পাশে শুইয়ে রেখেছিলাম, যাতে প্রয়োজন হলেই খিচুড়ি-মাখা হাতেই তুলে নেওয়া যায়।

খেতে খেতে তিতির বলল, "যাদের খোঁজে আমরা এসেছি, তারা ত্রিসীমানায় নেই। থাকলে এতক্ষণে তারা জেনে যেত।"

আমি বললাম, "ঋজুদা, তুমি অন্ধকারে বসে পাইপ টেনো না। বড়জাঠাকে খেমকরনের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি স্নাইপার কেমন সিগারেটের আগুন দেখে কপালের মধ্যিখানে গুলি করে শেষ করে দিল, মনে নেই?"

"হুঁ।"

হঠাৎ বাইরে কিসের আওয়াজ শোনা গেল। সকলে খাওয়া থামিয়ে কিসের আওয়াজ তা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। আওয়াজটা গাছ

থেকে আসছে। সঙ্গে ভয়ার্ত পাখির কিচিরমিচির। অনেক পাখির গলা একসঙ্গে। অথচ চিতা বা লেপার্ড গাছে চড়লে এর চেয়ে ভারী হত আওয়াজটা। ঋজুদা একটুক্ষণ উৎকীর্ণ হয়ে থেকে বলল, "খা, খিচুড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। দারুণ রেঁধেছে কিন্তু তিতির। যাই-ই বলিস্।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু আওয়াজটা কিসের ঋজুকাকা?"

ঋজুদা খিচুড়ি গিলে বলল, "দ্যাখ, বাঁদরমাত্রই বাঁদরামো করে। কিন্তু এই বাঁদরগুলো শুধু বাঁদরই নয়, রীতিমত ত্যাঁদোর। এই ধোঁয়াটে-ধূসর রঙের আফ্রিকান বাঁদরগুলোর নাম ভার্ভেট। অথবা গ্রিভেট্। এদের জুওলজিক্যাল নাম হচ্ছে, সার্কোপিথেকাস্ অ্যাথিওপস্। সোয়াহিলি নাম, টুম্বুলি। শব্দ শুনে মনে হল ত্যাঁদোর বাঁদর দুটো গাছে উঠে পাখিদের ডিম খাবার মতলব করছিল।"

"কী পাখি?" আমি শুধোলাম।

"সে কী রে রুদ্র! ডাক শুনেও চিনতে পারলি না? স্টার্লিং। সেরেঙ্গেটিতে এত শুনেছিস।"

ঠিক তো! মনে পড়ল আমার। তিতিরকে বললাম, "পুব-আফ্রিকায় কত রকমের স্টার্লিং পাখি আছে জানো তিতির? সাঁইত্রিশ রকমের। তার মধ্যে এই রুআহাতে অবশ্য দু' রকমই বেশি দেখতে পাওয়া যায়।"

"সুপার্ব আর অ্যাশি।" ঋজুদা যোগ করল।

তিতির বলল, "এই স-ম-স্ত এলাকা আগে হেহেদের ছিল? ওদের দেশ কেড়ে নিল কারা?"

"জার্মানরা। আবার কারা? পুরো পুব-আফ্রিকার নামই তো ছিল আগে জার্মান ইস্ট-আফ্রিকা। এখন যেখানে রুআহা ন্যাশানাল পার্ক, বিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই পার্ককেই বলা হত সাবা ন্যাশানাল পার্ক। জার্মানরাই করে গেছিল। কিন্তু তারও আগে আঠারোশো আটানব্বুই সনে হেহেদের বিখ্যাত সর্দার মকাওয়ায়ার সঙ্গে জোর যুদ্ধ হয়েছিল জার্মানদের। জার্মানদের কাছে হেহেদের তুলনাতে অনেক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। সুতরাং তারাই জিতেছিল। এখন তানজানিয়ান পার্লামেন্টের যিনি স্পিকার, তাঁর নাম হচ্ছে অ্যাডাম সাপি মকাওয়ায়া। তিনি হচ্ছেন সেই হেহে-সর্দারেরই নাতি। অ্যাডাম সাপি মকাওয়ায়া

তানজানিয়ান ন্যাশানাল পার্কস-এর জন্যে যে অছি পরিষদ বা ট্রাস্ট আছে, তার একজন ট্রাস্টিও।"

বাইরে হঠাৎ যেন শব্দ হল আবারও। ঋজুদা কান খাড়া করে শুনল। আমরাও। ঋজুদা হঠাৎ ঐটো আঙুল ঠোঁটে লাগিয়ে আমাদের চুপ করতে বলল। তাঁবুর গায়ের চতুর্দিকে কারা যেন ভারী পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। একবার তাঁবুর একটা দিক একটু দুলে উঠল। মনে হল তাঁবুটা এক্ষুনি আমাদের মাথার উপর ভেঙে পড়বে। ঋজুদা তাড়াতাড়ি তিতিরের নিভিয়ে-দেওয়া স্টোভটা জ্বালিয়ে হঠাৎ তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে দু' হাতে স্টোভটা তুলে ধরে আমাদের ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঐটো-হাতে সার-সার বিছের গর্তের উপর বসিয়ে রেখে চলে গেল। বাংলায় বলতে লাগল, "ও গণেশ! গণেশ বাবা। বাড়ি যা লক্ষ্মীটি। নইলে আমাদের সাহানিয়া দেবীকে নালিশ করে দেব। যা বাবা। বাবারা আমার। লক্ষ্মী মানিক আমার।"

আশ্চর্য। দেখতে দেখতে ওরা যেন সরে গেল। আরও কিছুক্ষণ বাইরে তাঁবুর চারপাশে ঘুরে ঋজুদা ফিরে এসে বলল, "নে তিতির, আবার গরম কর খিচুড়ি। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

তিতির শুধোল, "বাইরে কী এসেছিল ঋজুকাকা?"

আমি বললাম, "কটা ছিল?"

"হাতি। গোটা দশ-বারো। ভারী সভ্য-ভব্য দল।"

স্টোভের আলোতে দেখলাম তিতিরের মুখটা কালো হয়ে গেছে। হঠাৎ বাইরের অন্ধকার রাতকে খানখান্ করে দিয়ে উদোম উল্লাসে হাঃ-হুঃ-হুঃ-হাঃ হাঃ-হুঃ-হুঃ-হাঃ করে হায়না চিৎকার করে উঠল যেন তিতিরকে আরও বেশি ভয় পাওয়ানোর জন্যে।

বাহাদুরি করার অবশ্য কিছু নেই। আমাদের দেশের মতোই আফ্রিকান হায়নাদের ডাক রাতে যদি কেউ জঙ্গলের মধ্যে বসে শোনে তার ভয় না লেগে পারে না।

ভয় আমারও করছিল। কিন্তু সে কথা আর বলি। হাসি-হাসি মুখ করে তিতিরকে বললাম, "দাও এবার। গরম হয়ে গেছে এতক্ষণে।"

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল হ্যাঁক হ্যাঁক হ্যাঁক করে ডাকা ধনেশ পাখিদের গলার স্বরে। তাঁবুর দরজা খুললাম। তিতিরের দিকে তাকিয়ে দেখি গুঁড়িসুড়ি মেরে অসহায়ের মতো শুয়ে আছে বেচারি স্লিপিং ব্যাগে। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। কপালের কাছে এক ফালি নরম রোদ এসে পড়েছে। ওকে না-উঠিয়ে তাঁবুর বাইরে এলাম। শয়ে-শয়ে স্টার্লিং তাদের ডানায় রোদ ঠিক্‌রিয়ে ওড়াউড়ি করে বেড়াচ্ছে। আরও কত পাখি। সকলের নাম কি জানি? ঋজুদাকে দেখলাম না। স্কাউটিং করতে গেছে নিশ্চয়ই। জিপের ছাদ আর বনেটটা তখনও শিশিরে ভিজে আছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপ সেই সিক্ততা নিঃশেষে শুষে নেবে।

জিপের সামনে ঝোলানো ভিস্তির জলে মুখ ধুয়ে আমিও একটু এদিক-ওদিক ঘুরে নিলাম। আমরা একে ছাগল বলি। জল ভরলে এগুলোকে ছাগল-ছাগলই মনে হয়, অনেক মানুষকে যেমন জল না-ভরেও ছাগল-ছাগল দেখায়, তেমনি। মুখ ধোব কী? এত ঠাণ্ডা হয়ে ছিল জল যে, তা দিয়ে মুখচোখ ধুতেই চোখদুটো সদা খোসা ছাড়ানো লিচুর মতো ফ্যাকাসে-সাদা গোল্লু-গুল্লু হয়ে গেল আর সাধের মুখখানি একেবারে আফ্রিকার রিলিফ ম্যাপের চেহারা নিল। জিপের আয়নায় নিজেকে দেখেই এত মন খারাপ হয়ে গেল যে, বলার নয়।

এই ধনেশ পাখিগুলো গাছের গর্তে এবং বিশেষ করে বাওবাব গাছের ফোকরে বাসা বাঁধে। এদের সোয়াহিলি নাম, ঋজুদার কাছে শুনেছি, হণ্ডো-হণ্ডো। জুওলজিকাল নাম হচ্ছে, ভন ডার ডিকেনস্ হর্নবিল। ধনেশের ইংরিজি নাম হর্নবিল। আমাদের দেশের জঙ্গলে দু'রকমের ধনেশ দেখেছি। ওড়িশার মহানদীর দুপাশের জঙ্গলে, বিহারের সিংভূমের সারাণ্ডার জঙ্গলে—যাকে বলে দ্য ল্যাণ্ড অব সেভেন হান্ড্রেড হিলস্ এবং মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে। আমরা বলি বড়কি ধনেশ, ছোটকি ধনেশ। গ্রেটার অ্যাণ্ড লেসার ইণ্ডিয়ান হর্নবিলস্। জার্মান পুব-আফ্রিকার জার্মান সাহেব ভন ডার ডিকেনস্ বোধ হয় এই পাখি প্রথম দেখেন এখানে। ইংরেজদের যেমন লর্ড, জার্মানদের ভন্।

দু-একটা পাখি-টাখি কি এখনও অনাবিষ্কৃত নেই? থাকলে, ভন রুদ্র অথবা মাদমোয়াজেল্ তিতিরের নামে তাদের নামকরণ করা যেত।

জার্মানরা কি সে সুযোগ দেবে আমাদের? এমন গুণী এবং পাগল জাত এরা যে, যেখানে গেছে সেখানকার সবকিছুকেই খুঁটিয়ে দেখে, চেখে, আবিষ্কার, পুনরাবিষ্কার করে রেখে গেছে। আমাদের জন্যে কোনো কিছুই রেখে যায়নি তারা, বাহবা নেওয়ার জন্যে।

হঠাৎ দেখি, একদল হলদে-বাঙা বেবুন সিংগল ফাইলে মার্চ করে আমার দিকেই আসছে। এমন হলুদ বেবুন যে হয়, তা কখনও জানতাম না। প্রথমে মনে হল জণ্ডিস্ হয়েছে বোধ হয়। লিভারের ন্যাবা রোগেই বেচারিদের এমন ন্যালাখ্যাপা অবস্থা। তারপরই মনে হল, তাইই কি? এত বেবুনের একসঙ্গে জণ্ডিস হওয়াটা একটু আশ্চর্যের ব্যাপার।

আমি যখন তাদের স্বাস্থ্যচিন্তায় ভরপুর ঠিক তক্ষুনি লক্ষ করলাম যে, ওদের চোখমুখের চেহারা মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন নয়। বে-পাড়ায় মস্তানি করতে আসা ছোকরার প্রতি পাড়ার ছেলেদের যেমন মনোভাব, বেবুনগুলোর মুখচোখের ভাব অনেকটা সেরকম। ব্যাপার বেগতিক দেখে আমি তাঁবুর দিকে ফিরতে লাগলাম। আমার ভয় লেগেছে বুঝতে পেরে ন্যাবাধরা হলুদ বেবুনের মতো বেবুনগুলো যেন খুব মজা পেল। খিঁচিক্ চিটিক্ চিটিক্ খিঁচিক্ করে চেঁচাতে চেঁচাতে তারা আমার দিকে ধেয়ে এল।

মনে-মনে 'ও ঋজুদা গো! কোথায় গেলে গো! এত বড় শিকারিকে শেষে বাঁদরে খেলে গো!' বলে নিঃশব্দ ডাক ছাড়তে ছাড়তে প্রায় দৌড়ে গিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে যাব এমন সময় তিতিরের সঙ্গে একেবারে হেড-অন্ কলিশান। তিতির কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে ঠেলে ভেতরে সরিয়ে তাঁবুর দরজা বন্ধ করলাম। ততক্ষণে ইয়ালো বেবুনের প্লেটুন এসে গেছে। তাঁবুর দরজা একটু ফাঁক করে আমি আর তিতির টিকিট না-কেটেই সার্কাস্ দেখতে লাগলাম।

চার-পাঁচজন করে সটান দাঁড়-করানো জিপ দুটোর মধ্যে ঢুকে পড়ল। সর্বনাশ! চোক্, সাইড লাইট এ-সবের সুইচ নিয়ে টানাটানিও করতে লাগল। স্টিয়ারিংটা ধরে এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল। তারপর টাইট দেখে খিঁচিক্ করে আওয়াজ করে জিপের সামনের সিটে রাখা ঋজুদার পাইপটা একজন গম্ভীরমুখে তুলে নিল। নিয়ে, প্রথমে বাঁ পায়ের পাতা

চুলকোল একটু, তারপর কালো রঙের কলা ভেবে খেতে গিয়েই মুখে পোড়া তামাক ঢুকে যাওয়াতে রেগেমেগে কটাং করে কামড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডানহিলের পাইপ ফটাস্ করে ফেটে গেল। ভাঙা অংশটা বিড়ির মতো দু'বার ফুঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার তারা জিপ থেকে নেমে পড়ল। যে পাইপ খাচ্ছিল সেইই মনে হল পালের গোদা। সব পালের গোদাদের বোধহয় পাইপ খুবই পছন্দ, যেমন আমাদের পালের গোদারও!

তারা একদিক দিয়ে গেল, ঋজুদাও অন্যদিক দিয়ে এল। সাতসকালে এ কী বিপত্তি!

ঋজুদা বলল, "চল্ চল্। তাঁবু তোল। এক্ষুনি আমাদের যেতে হবে। এখান থেকে আধ মাইল দূরেই হাতির রাস্তা। ঐ রাস্তাতে পোচারদের যাতায়াতের চিহ্ন আছে। আজকের মধ্যেই আমরা একটা পাকাপোক্ত ক্যাম্প না করে ফেলতে পারলে একেবারে বোকার মতো ওদের হাতে পড়তে হবে।"

ঋজুদাকে তিতির বলল, "এগুলো কী বেবুন ঋজুকাকা? রুদ্র বলছিল ওদের নাকি জণ্ডিস হয়েছে?"

ডান্‌হিলের পাইপটার অমন দুর্গতি এবং তখনকার টেনশানের মধ্যেও ঋজুদা হেসে ফেলল।

বলল, "রুদ্রটাকে নিয়ে পারা যায় না। কী কল্পনা! ওরা ঐরকমই হয়। ওদের নামই ইয়ালো-বেবুন। সোয়াহিলি নাম হচ্ছে নিয়ানি। জুওলজিকাল নাম, প্যাপিও সাইনোসেকালাস্।"

"পাপী যে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।" তাঁবুর খোঁটা ওঠাতে ওঠাতে আমি বললাম।

সব গোছগাছ হয়ে গেলে ঋজুদা আর তিতির ঋজুদা যে জিপ চালাচ্ছিল তাতে উঠল। পেছনের জিপটাতে আমি।

"তুই আগে যা রুদ্র। দশ কিলোমিটার গিয়ে দাঁড়াবি।"

"কোন্ দিকে যাব? রাস্তা বলতে তো কিছু নেই কোনোদিকে।"

"কালকে যে পাহাড়টার নাম রাখলি তুই টেডি মহম্মদ, সেই দিকে যাবি আস্তে আস্তে, খানাখন্দ, কাঁটা-টাটা বাঁচিয়ে। খুব সাবধানে যাবি। পিস্তলটার হোলস্টার খুলে রাখিস, যাতে বের করতে সময় না লাগে।"

"ওক্কে!" বলে আমি জিপ্ স্টার্ট করে এগিয়ে গেলাম। বোধ হয় পঞ্চাশ গজও যাইনি, আমার জিপের আয়নায় দেখলাম তিতির ঋজুদার পাশে বসে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে। এমন জোরে লাফাচ্ছে যে, ওর মাথা ঠেকে যাচ্ছে জিপের ছাদে। আর ঋজুদা জিপ থামিয়ে দিয়ে হো-হো করে হাসছে।

ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট্ করতে হচ্ছে। এঞ্জিন বন্ধ করে জিপ থেকে নেমে তিতিরের দিকে গিয়ে বললাম, "কী হল? হলটা কী?"

"চুপ করো। অসভ্য!" বলল তিতির।

হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। এই অসভ্য কথাটা মেয়েরা যে কতরকম মানে করে ব্যবহার করে, তা ওরাই জানে। এই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যে, অসভ্য বলে ও আমার উপর অহেতুক রাগ দেখাল। রাগকে আবার অহেতুক বললে ওরা চটে যায়। অহেতুক রাগের আর-এক নাম হচ্ছে অভিমান। নাঃ, বাংলা ভাষাটা, বিশেষ করে বাঙালি মেয়েদের মুখে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে দিনকে দিন।

এমন সময় তিতির হুড়মুড়িয়ে দরজা খুলে নামল প্রায় আমার ঘাড়েই। অন্যদিক দিয়ে ঋজুদা। ঋজুদা তখনও হাসছিল। হাসি থামিয়ে আমাকে বলল, "রুদ্র, ড্যাশবোর্ডের পকেট থেকে ঝাড়ন বের করে তিতিরের সিটটা ভাল করে মুছে দে। তিতিরকেও একটা ঝাড়ন বের করে দে। বেচারি!"

ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝতে না-পেরে আমি বোকার মতো ঝাড়ন বের করলাম। একটা তিতিরকে দিলাম। অন্যটা দিয়ে তিতিরের সিটটা মুছতে লাগলাম। বিতিকিচ্ছিরি গন্ধ। একেবারে অন্নপ্রাশনের ভাত উগ্‌রে আসবে মনে হতে লাগল। তিতির দেখলাম ঝাড়নটি নিয়ে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল।

ঋজুদাকে ফিসফিস করে শুধোলাম, "ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার আইসক্রিম! এতক্ষণ আমার পাইপ ভেঙে দিয়ে গেছে বলে খুব আনন্দ করছিল ও, প্রথম ক্ষতিটার চোট আমার সম্পত্তির উপর দিয়েই গেল বলে, কিন্তু সিটে বসেই বলল, সিটের উপর এত শিশির পড়ল কী করে? তোমার সিটও কি ভেজা ঋজুকাকা?

"না তো! আমি বললাম।

"তবে ? আমার সিট ভিজে চুপচুপ করছে। উঃ, কী গন্ধ রে বাবা! মাগো! কী এসব সিটের উপর ?

"ডান হাতের আঙুল ভেজা সিটে একবার ছুঁইয়ে নাকের কাছে এনে গন্ধ নিলাম। ওকে শুধোলাম, বেবুনরা কি এই সিটেও বসেছিল ?

"তিতির বলল, হ্যাঁ। তিন-চারটে বসেছিল পাশাপাশি—প্যাসেঞ্জারদের মতো!

"ওদের দোষ কী ? জঙ্গলে তো এমন সুন্দর বদ্ধ-টদ্ধ বাথরুম পায় না ওরা সচরাচর। তাও তোর ভাগ্য ভাল যে বড় কিছু——

"ম্যাগো! ব্যাব্যাগো! ওঃ মাই গড্—বলে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগল তিতির।"

ঋজুদা থামতেই আমিও বলে উঠলাম "ওয়াক্ থুঃ। তুমি আমাকে দিয়ে মোছালে ? ঈসস্!"

"তুই তো মুছেই খালাস। তিতিরের কথা ভাব তো! বেচারির পিঠ-পা সব একেবারে হলদে বেবুনের স্মৃতিবিজড়িত হয়ে গেছে!"

এমন সময় হঠাৎ 'কূঃ' করে সংক্ষিপ্ত চাপা একটা ডাক ভেসে এল আমাদের পেছন দিকের কোনো গাছ থেকে। বাঁ দিকে, আমাদের কাছ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরের কোনো গাছের উপর থেকে 'কূঃ' বলে কে যেন সাড়াও দিল।

ঋজুদার মুখচোখের চেহারা পালটে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে স্টিয়ারিং-এ বসলাম। ঋজুদাও স্টিয়ারিং-এ বসে তিতির যেদিকে গেছে সেই দিকে জিপটা নিয়ে গেল। জিপ স্টার্ট করেই আমি আয়নায় দেখলাম যে তিতিরও দৌড়ে এসে উঠল ঋজুদার পাশে। যতখানি সাবধানে এবং যতখানি জোরে পারি চালাতে লাগলাম জিপ।

এবড়ো-খেবড়ো পথ। পথ মানে, জিপের চাকা যেখান দিয়ে গড়িয়ে দিচ্ছি সেই ফালিটুকুই। সামনে নজর রাখছি, টেডি মহম্মদ পাহাড়টা যেন হারিয়ে না যায়। মাঝে মাঝেই গাছগাছালির আড়ালে পড়ে যাচ্ছে পাহাড়টা।

দু' কিলোমিটার মতো আসার পর বাঁ দিকে একটা শুকনো নদী পেলাম। জিপ নদীতে নামিয়ে দেব কি না ভাবছি, কারণ নদীরেখা বরাবর

চলে গেছে ঐ পাহাড়ের দিকেই। নদীতে নামিয়ে দিলে অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। পেছন থেকে 'কূ' দিল কারা ? তাদের 'কূ' যে আমাদের 'কূ' বয়ে আনবে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

এখন পেছনে তাকালে কিমিরোওয়াটেঙ্গে পাহাড়শ্রেণী চোখে পড়ছে। সামনের বালি-নদীটা নিশ্চয়ই মাওয়াগুশি বালি-নদীর কোনো শাখা হবে।

দেখতে দেখতে ঋজুদাও এসে গেল। আমি আঙুল দিয়ে ইশারা করে শুধোলাম, নদীতে নামাব কিনা জিপ। ঋজুদা ইশারায় পরমিশান দিতেই স্পেশ্যাল গিয়ার চড়িয়ে নিয়ে নামিয়ে দিলাম। একেবারে অধঃপতন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' বইটি বড়দের বই হলেও, কায়দা করে মার লাইব্রেরি থেকে ম্যানেজ করে পড়ে ফেলেছিলাম। তাতে একটি জম্পেস্ ডায়ালগ আছে। সুশোভনকে নুটু মোক্তার বললেন, "ছিঃ ছিঃ তোমার এত বড় অধঃপতন!" সুশোভন বললেন, "পতন তো চিরকাল অধঃলোকেই হয় নুটুদা, কে আর কবে ঊর্ধ্বলোকে পড়েছে বল!"

তরতর করে জিপ চলতে লাগল। এখন আর কাঁটা-টাটার ভয় নেই। তবে টিউব যে কখন পাংচার হবে তা টিউবই জানে। খারাপ মানুষ স্টিয়ারিং-এ বসলে ওরা জায়গা বুঝে পাংচার হয়। প্রত্যেক গাড়ির টিউবই মানুষ চেনে। সামনেই নদীটা একটা বাঁক নিয়েছে, হঠাৎ। দূরের টেডি মহম্মদ পাহাড়টা আস্তে আস্তে কাছে আসছে। মনে হচ্ছে বেশ বড় বড় গুহা আছে পাহাড়টাতে। সকালের রোদে দূর থেকে তাদের উপর আলোছায়ার খেলা দেখে মনে হচ্ছে কোনো ভাল ক্যামেরাম্যান বা আর্টিস্ট আমাদের সঙ্গে থাকলে এই আলোছায়ার খেলা নিয়ে এক আশ্চর্য কবিতা লিখতে পারতেন। ফোটোগ্রাফি বা ছবি সবই তো আলোছায়ারই খেলা। নদীর দুপাশে আবার অন্ধকার-করা নিবিড় ঠেতুলগাছ। ঠাকুমার চেয়েও বয়সে কত বড় হবে এরা প্রত্যেকে। এদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। যে-কোনো মহীরুহ দেখলেই মনে হয়, যেন ইতিহাসের সামনে, কথা-কওয়া অতীতের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মন আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে। সকলের হয় কিনা জানি না। ঋজুদাই আমার সর্বনাশ করল। তার কাছ থেকে এমন এমন সব রোগের ছোঁয়াচ এল

আমার ভিতরে যা এ-জীবনে কোনো ওষুধেই সারবে না আর।

এদিকে অনেক ভালগাছও দেখছি। মা টবের মধ্যে নানারকম ক্যাকটাই করেন। ফুলের গাছের মতো সেগুলো বাইরের বাগানে না-রেখে বসবার ঘরে, বারান্দাতে রাখেন। এখানে একরকমের ক্যাকটাই দেখলাম। তাকে, ক্যাকটাই না বলে দ্য গ্রেট-গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদর অব ওল্ ক্যাকটাই বলা ভাল। এই গাছগুলোর নাম ক্যান্ডালাব্রা। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বলেন, ইউফোরবিয়া ক্যানডালাব্রাম্। আফ্রিকার ইউফোরবিয়াই নতুন সভ্য পৃথিবীর ক্যাকটাই। গণ্ডাররা এর কাঁটা খেতে খুব ভালবাসে। বুদ্ধি মোটা না হলে কি আর অমন চেহারা হয়?

গণ্ডারের কথা ভাবতে ভাবতেই যেই নদীটার বাঁকে পৌঁছেছি এসে, অমনি দেখি, ঠিক সেই বাঁকের মুখেই নদীর বালির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন দুই বিশাল মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস গণ্ডারিয়া। তাদের কাঁধে বসে আছে হলুদরঙা এবং লাল-ঠোঁট পোকা-খাওয়া পাখি। অক্স-পেকার।

জিপ দেখেই বদ্‌খত্ চিৎকার করে পাখিগুলো গণ্ডারদের পিঠ ছেড়ে উড়ে গেল। এবং গণ্ডার দুটো জিপটাকে আরেকটা সাংঘাতিক গণ্ডার ভেবে খপর্-খাপর্ আওয়াজ তুলে অত্যন্ত আনকুথলি, আনস্মার্টলি নদীর বুক ছেড়ে জঙ্গলে চলে গেল। পেছনে চেয়ে দেখলাম, অজুদার জিপও আমার জিপের হাত-তিরিশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তিতির জিপের মাথার পর্দার জানলা খুলে দাঁড়িয়ে উঠে অনিমেষে দেখছে। গণ্ডারের মতো কুৎসিত জানোয়ারের কুৎসিততম লেজ যে এত কী দেখবার আছে জানি না! পারেও তিতির!

আর একটু এগোলেই টেভি মহম্মদ পাহাড়ের নীচে পৌঁছে যাব। অজুদা ঠিক জায়গাই বেছেছে মনে হচ্ছে ক্যাম্পের জন্যে। পাহাড়টা ন্যাড়ামতো উপরে, কিন্তু গায়ে গাছগাছালি আছে নানারকম। আছে গুহার চারপাশেও। অথচ পাহাড়ের নীচে বেশ কিছুদূর অবধি ফাঁকা। কারণটা কী তা ওখানে গেলেই বোঝা যাবে। হয়তো হাতিদের যাতায়াতের পথ আছে—গাছপালা সামান্য যা ছিল পথে, উপড়ে দিয়েছে তারা। যাইই হোক, পাহাড়ের কোনো গুহাতে যদি আস্তানা গাড়ি আমরা, তাহলে নীচটা ফাঁকা থাকাতে ঐ পাহাড়ের কাছে আমাদের চোখ এড়িয়ে কেউই আসতে

পারবে না।

গণ্ডারগুলো দৌড়তে দৌড়তে আবার আমাদের দিকেই মুখ করে এগিয়ে আসছে। আসলে ইচ্ছে করে হয়তো নয়; নদীটা এমন ভাবে বাঁক নিয়েছে যে, ওদের পথের কাছাকাছি কেটে গেছে সে পথ। এইরকম গণ্ডার কিন্তু গুগুনোগুম্বারের দেশের সেরেঙ্গেটি প্লেইন্‌সে দেখিনি। এদের বলে 'ব্ল্যাক রাইনো'। আর সেরেঙ্গেটির গণ্ডারদের বলে 'হোয়াইট রাইনো'। আসলে ব্ল্যাক রাইনোর গায়ের রঙ কিন্তু কালো নয়, যেমন নয় হোয়াইট রাইনোর গায়ের রঙ সাদা। 'হোয়াইট' কথাটা 'ওয়াইড'-এর বিকৃতি। এখানকার গণ্ডারদের মুখ অনেক চওড়া হয় সেরেঙ্গেটির, মানে, গুগুনোগুম্বারের দেশের গণ্ডারদের চেয়ে। কেন চওড়া হয়, তা সহজে বোঝা যায়। কারণ এখানকার গণ্ডাররা চ'রে-বরে খায় গোরু-মোষের মতোই, অর্থাৎ যাদের ইংরিজিতে বলে 'গ্রেজার'। আর সেরেঙ্গেটির গণ্ডারেরা জিরাফের বা অ্যান্টিলোপদের মতো কাঁটাগাছ বা পাতা-পুতা গাছ মুড়িয়ে খায়, যাদের ইংরিজিতে বলে 'ব্রাউজার'। গণ্ডাররা চোখে কম দেখে, ভটকাই-এর দাদুর মতো কিন্তু ঘ্রাণ এবং শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। নাকের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও ভটকাই-এর দাদু কাউকেই চিনতে পারেন না। কিন্তু পাশের বাড়ির মেয়ে বান্টি শীতের দুপুরে ধনেপাতা কাঁচালঙ্কার সঙ্গে কদবেল মেখে খেলে, অথবা ভটকাই ছাদে বসে পরীক্ষার আগের দিন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ম্যাচের রিলে অত্যন্ত ক্ষীণ ভল্যুমে শুনলেও যেমন তিনি ঠিক গন্ধ পান এবং শুনতে পান, গণ্ডারদের ব্যাপার-স্যাপারও অনেকটা তেমনি।

ভটকাইটাকে খুবই মিস করছি। 'অ্যালবিনো'র রহস্য ভেদ করার সময়ও বেচারা আসতে পারল না। আর এবারে উড়ে এসে জুড়ে বসল তিতির। যেন বায়না নিয়ে যাত্রাগান করতে এলাম আমরা। ফিমেল ক্যারেকটার ছাড়া যাত্রা ত' জমবে না।

ওরে ওরে ভটকাই,
আয় তোকে চটকাই
জাপটিয়ে ধরি তোকে সোহাগে,
তিতির কাবাব হবে,
লিখন কে খাওয়াবে ?
ডাইমেনস্ লিব্ ?
যত খটকাই !

আহা ! বাল্মীকির মতোই রুদ্র রায়চৌধুরীর মুখ দিয়েও অকস্মাৎ কবিতা বেরিয়ে গেল। বন-পাহাড়ের এফেক্টই আলাদা ! যে-শাখায় ব'সে সেই শাখাই কাটছিলেন মহাকবি কালিদাস ; সেই শাখারই অন্যদিকে যে রুদ্র নামের কোনো মহাকপি বসে সেই মুহূর্তে লেজ নাচাচ্ছিল না এমন কথা তো শাস্ত্রে লেখা নেই। কপির কবিতা বলে কতা ! একেবারে জমজমাট, ফুলকপিরই মতো।

নদী পেরিয়ে যেখানে এলাম সেখানে পাড়টা কম নিচু এবং গণ্ডারদের যাতায়াতের কারণে প্রায় সমতলই হয়ে এসেছে। পেরিয়ে, টেভি মহম্মদ পাহাড়ের দিকে চলতে লাগলাম। মিনিট-কুড়ির মধ্যেই জায়গাটাতে পৌঁছে গেলাম। ঋজুদা হর্ন না-দিয়ে জোরে চালিয়ে আমাকে ওভারটেক করে আগে আগে গিয়ে দুটি পাহাড়ের মাঝের সমতল জমিন ফালিটুকুর মধ্যে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে পিছনে আমিও পৌঁছলাম।

চমৎকার জায়গা। এখানে যদি আমরা পার্মানেন্ট ক্যামপ করি তাহলে এক হেলিকপ্টার অথবা প্লেন ছাড়া কেউই আমাদের দেখতে পাবে না। আর পাহাড়ের মাঝামাঝি আমাদের মধ্যে যদি কেউ জঙ্গলের মধ্যে হাইড-আউট বানিয়ে নিয়ে বাইনাকুলার নিয়ে পাহারা দেয় তাহলে তো কেউ আসতেই পারবে না কাছে। তবে, বিপদ হবে, পাহাড় টপকে কেউ যদি আসে। পাহাড়ের ওপাশে কী আছে ? কেমন জঙ্গল ? নদী আছে কি নেই ? তা পরে দেখতে হবে।

ঋজুদা জিপ থেকে নেমে কোমর থেকে হেভি পিস্তলটা খুলে

সাইলেন্সারটা লাগিয়ে নিল। মুলিমালোঁয়ায় আলবিনোর রহস্যভেদের পর থেকে এই পিস্তলটা খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছে ঋজুদার। গুহা আছে পর পর তিনটে। একটা বড়। দুটো ছোটো। ঋজুদার পিছন পিছন আমরাও এগোতে লাগলাম পিস্তল খুলে নিয়ে।

বড় গুহাটার দিকে উঠছি এমন সময় বাজ-পড়ার মতো গদদাম্ আওয়াজ করে গুহার মধ্যে থেকে সিংহ ডাকল।

খাইছে !

বাজ-পড়ার আওয়াজের মতো ডেকেই, ন্যাদস্-ন্যাদস্ করে আরামে কোমর দুলিয়ে চলা পশুরাজ হঠাৎই বিদ্যুতের ঝলকানির মতো অতর্কিতে ছুটে বাইরে এল। তার পেছনে পেছনে তিনটি সিংহী। একমুহূর্ত, ঋজুদা একাই নয়, আমরা তিনজনই তা দেখে থমকে দাঁড়ালাম। ঋজুদা, আমি এবং তিতির হাত সামনে লম্বা করে ট্রিগারে আঙুল ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কী যে মনে করে, তাঁরাই তা জানেন, বেড়াল-পরিবারের কুলীনরা পোষা বেড়ালেরই মতো সদলবলে পাথর টপ্‌কে-টপকে নেমে পাহাড়ের খোল পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তিতির বলল,"একদম ছোটমাসির বেড়ালটার মতো। নেকু-পুষু-মুনু ! আমার মনে হচ্ছিল, কাছে গিয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে ঘুঙ্কু-মুনু পুঙ্কু-মুনু করে আদর করে দি !"

আমার কথা বন্ধ হয়ে গেছিল ওকে দেখে। ঘুঙ্কু-মুনু পুঙ্কু-মুনুরা যে কী জিনিস তা তো তিতিরসোনার জানা নেই ! উঃ ! অসীম ক্ষমতা ওর। দা গ্রাণ্ডমাদার অব ওল "নেকুপুষুমুনুজ"।

গুহাটার মুখে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে ঋজুদা ভাল করে দেখেশুনে নিল। তারপর ঢুকে পড়ল।

মনে মনে পূর্ণকাকার মতো বললাম, বোমশঙ্কর।

বেশ বড় গুহা। আমাদের জিনিসপত্র সমেত তিনজনের চমৎকার কুলিয়ে যাবে। ভাবা যায় না ! সেলামি নেই, এমনকী ভাড়াও নেই ; কলকাতার বাড়ির দালালরা যদি এ গুহার খোঁজ পেত। কোথা থেকে যেন আলোও আসছে মনে হল। একটু এগোলেই বোঝা যাবে। এমন সময় আমার পেছন পেছন আসা তিতির 'ইরি বিবি রে, ইরি মিমি রে, কী

ই-ই-ই-ই-দুর পচা গন্ধ রে বাব্বা—আ—আ—আ বলে প্রায় কেঁদে উঠল।

ঋজুদা এবার ধমকে দিল, "স্টপ ইট তিতির।"

বিরক্ত গলায় বলল, "আমরা কি পিকনিক করতে এসেছি বলে তোর ধারণা?"

তিন-দিক-বন্ধ গুহার মধ্যে সিং আর সিংহীদের গায়ের এবং কতদিনের মলমূত্রের গা-গুলোনো বিটকেল গন্ধ,তার উপর আবার ঋজুদার ধমক। তিতির ই-ই-ই-ই করে কাঁদতে লাগল।

হাত না-নাড়িয়ে হাততালি দিলাম মনে মনে। ঠিক হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

গুহার ভিতরটা সমুদ্র থেকে তোলা গোয়ার পোর্ট-আগুয়াড়া হোটেলের ছবির মতন। হুবহু এক। সামনেটা গোলাকার—আগুয়াড়া ফোর্টেরই মতো—তারপর একটা হাত চলে গেছে বাঁয়ে, একটা ডাইনে। ডান এবং বাঁ দিক থেকে পাথরের ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। অনেক ফাঁক-ফোক আছে। তবে ভরসার কথা, সেগুলো পাশে। বৃষ্টি পড়লে বা শিশির ঝরলে সরাসরি গায়ে পড়বে না। রোদও লাগবে না।

ঋজুদা বলল, "ফার্স্ট ক্লাস। ক্যানডালাব্রার ডাল কেটে নিয়ে রুদ্র ও তিতির এক্ষুনি খেজুরের ডালের মতো ঝাঁটা করে নিয়ে গুহাটাকে ভাল করে ঝাঁটি দিয়ে বসবাসের যোগ্য করে তোল। আমাদের আজকের মধ্যেই এখানে সব গুলে-মেলে বসে কাল থেকে কাজ শুরু করতে হবে। প্রস্তুতিতেই তো অনেক দিন চলে গেল। আর সময় নেই সময় নষ্ট করবার।"

গুহা থেকে বাইরে বেরোতে বেরোতে তিতির বলল, "সিংহ-সিংহীরা তো ফিরে আসবে সন্ধেবেলায়, তখন?"

বললাম," এ গুহা তখন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের দখলে। ফিরে ঐসে দেখুকই না।"

গুহার মুখে পৌঁছে গেছি প্রায় আমরা, হঠাৎ ঋজুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল। বলেই, আমাকে ও তিতিরকে দুপাশে সরে যেতে বলে, নিজে ঐ দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে শুয়ে পড়ে পিস্তলটা সামনে ধরে তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে কী যেন দেখতে লাগল।

এবারে আমরাও দেখতে পেলাম। একটা খাকি-রঙা জিপ এসে লেগেছে আমাদের জিপদুটোর একেবারে পাশে। বলা বাহুল্য যে, আমাদের ওরা ফলো করেই আসছিল এতক্ষণ। একজন হাতে রাইফেল নিয়ে গুহার মুখের দিকে নিশানা নিয়ে জিপে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দুজন লোক, হাতে টুয়েলভ বোরের শটগান নিয়ে গুহার দিকে উঠে আসছে। ওদের মধ্যে একজন বেঁটেখাটো, গায়ে খাকি পোশাক, অন্য জন প্রায় উলঙ্গ, সাড়ে-ছ ফিট লম্বা, মিশকালো, মাথায় রঙিন পাখির পালক-গোঁজা আফ্রিকান। তার যা চেহারা, তাতে আমাকে আর তিতিরকে নিয়ে দু' হাতে লোফালুফি করতে পারে ইচ্ছে করলেই। খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমাদের। পথেই যে আমাদের অ্যামবুশ্ করেনি, এইই ঢের।

তিতির ফিসফিস করে বলল, "শ্যাল আই ?"

"নো। নো।" বলল ঋজুদা। গলা আরও নামিয়ে বলল, "এখানে শব্দ করা একেবারেই চলবে না।" তারপরই দু হাত দিয়ে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ধরে জিপের কাছে দাঁড়ানো বুক-টানটান লোকটার বুকের দিকে প্রথমে নিশানা নিল। পিস্তলের পক্ষে বেশ বেশি দূরত্বেই আছে লোকটা। সে লোকটাও লম্বা-চওড়া, তবে খাকি পোশাক পরা।

কী হল বোঝার আগেই 'ব্লপ্' করে একটা আওয়াজ হল ঋজুদার পিস্তলের মাজল্ থেকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল। পড়বার সময় তার রাইফেলের নলের ঠোকা লাগল জিপের বনেটের সঙ্গে। জোর শব্দ হল তাতে।

যে লোকদুটো গুহার মুখের দিকে আসছিল তারা নীচের লোকটার পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে, কোনো গুলির আওয়াজ না-পেয়ে এবং কাছে কাউকে না-দেখে, একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে ঐ লোকটার দিকে দৌড়ে যেতে লাগল।

বনপাহাড়ের সব লোকেরই ভূত-প্রেতের ভয় আছে। আমাদের দেশের লোকের যেমন আছে, আফ্রিকার লোকদেরও আছে। ঋজুদা, বাঁ হাতটা ছেড়ে দিয়েই, পিস্তলটাকে একবার ডাইনে আরেকবার বাঁয়ে নিয়ে পরপর ট্রিগার টানল। ব্লপ, ব্লপ। পেছন থেকে গুলি খেয়ে লোকদুটো যেন শূন্যে

একটু লাফিয়ে উঠে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল। ওদের মধ্যে ঐ প্রায়-উলঙ্গ লোকটি পড়ে গিয়েও বন্দুকটা তুলে ধরেছিল গুহার মুখের দিকে, কিন্তু তার বন্দুক-ধরা হাত নেতিয়ে গেল। হেভি পিস্তলের গুলি তার ফুসফুস ভেদ করে গেছিল। অন্য লোকটার নিশ্চয়ই হৃদয়ে গুলি লেগেছিল। সে এমনভাবে বাঁ হাতটা মুচড়ে পড়েছিল যে, দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন জন্মমুহূর্ত থেকেই ঘুমুচ্ছে অমন করে।

তিতির চাপা গলায় বলল, "আই! ঋজুকাকা! তুমি তো দেখছি জেমস্ বণ্ড! ইরিব্বাবা!"

ঋজুদা উত্তর না দিয়ে বলল, "আমি হাত দিয়ে ইশারা না করলে তোরা বাইরে আসবি না।" বলেই, পিস্তলে তিনটি গুলি ভরে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। গুহার মুখটা প্রায় আড়াল করে দু' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল ঋজুদা। তার দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায় বাইরের, তাইই দেখছিলাম।

মিনিট-দুই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ঋজুদা বাঁ হাত নেড়ে ইশারা করল আমাদের। আমরা বাইরে যেতেই খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, "রুদ্র, অনেক কাজ এখন তোর। যা বলছি, চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শোন।"

হাতে সময় বেশি ছিল না। ঋজুদা সংক্ষেপে যা বলল গুহা ছেড়ে নেমে আসতে আসতেই শুনে নিলাম সব। ওদেরই জিপে আমি আর ঋজুদা ধরাধরি করে রক্তাক্ত লোক তিনটিকে তুলে দিলাম। তিতিরও এগিয়ে এসেছিল সাহায্য করতে কিন্তু অত রক্ত দেখে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠল। করেই, সরে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ল দু'হাতে মুখ ঢেকে।

আমি জানতাম এরকম হবে। ওর দোষ নেই। যখন শিকার করি তখনও ট্রফির ঘাড়ে বা বুকে দূর থেকে দারুণ মার্কসম্যানের মতো একখানা গুলি ঠুকে দিয়ে তাকে ধরাশায়ী হতে দেখে ভাল লাগে। নিজেকে নিজেই মনে মনে পিঠ চাপড়াই। কিন্তু তারপর শিকার করা জানোয়ারের কাছে যেতে বড়ই খারাপ লাগে। রক্ত বড় খারাপ দৃশ্য। কতবার মনে হয়েছে, প্রাণ নেওয়া তো সহজ, প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা কি আমার আছে ? আর এ তো জানোয়ার নয়, এরা যে মানুষ ; যারা পাঁচ

মিনিট আগেও আমার চেয়েও অনেক বেশি জীবন্ত ছিল।

এত কথা ভাবলাম যতক্ষণে, ততক্ষণে ওদের জিপের স্টিয়ারিং-এ বসে আমি সেই বালিনদীর কাছে চলে এসেছি। কিন্তু আমরা যেখান দিয়ে নদী পেরিয়েছি সেখান দিয়ে পার হলে চলবে না। আমাদের ক্যাম্প ওদের দলের অন্যদের চোখে পড়ে যাবে। তাই নদীর পাড় দিয়ে আস্তে আস্তে চলেছি, নদীতে নামার মতো এবং উলটোদিকে ওঠার মতো জায়গা দেখলেই নামব। নদী পেরিয়ে গিয়ে তারপর জোর জিপ চালাতে হবে, দুটি কারণে। বেশি দেরি হলে জিপময় রক্ত ভরে গেলে, তা পথে চুঁইয়ে পড়বে। এবং রক্তের চিহ্ন রয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, মৃতদেহগুলো সমেত জিপটা অনেক দূরে কায়দা করে ফেলে রেখে আমাকে পায়ে হেঁটেই একা একা পথ চিনে ফিরে আসতে হবে গুহায়। যদি জঙ্গলে পথ হারিয়ে যাই! পথই তো নেই, তার পথ! সব জায়গাকেই পথ বলে মনে হয় এসব জায়গায়। যে-কোনো জঙ্গলেই।

জিপটা চালিয়ে মোটেই আরাম নেই। বোধহয় শক-অ্যাবসর্বার গেছে। সর্বক্ষণ ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ করছে এবং পেছনে মরা মানুষগুলো সমেত যা-কিছু আছে সব কিছুই ঝাঁকাচ্ছে। নদীরেখাকে পাশে রেখে মাইল-দুয়েক গিয়ে একটা পথ পেলাম। একেবারে ফার্স্ট ক্লাস। কোলকাতার রেড রোডের মতো। হাতিদের যাতায়াতের পথ। হাতিদের যাতায়াতের পথ দেখেই তো পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এঞ্জিনিয়াররা পথ বানান।

নদী পেরিয়ে এলাম। একবার পিছনে তাকালাম। টেডিমহম্মদ পাহাড়টা ভাল করে দেখে নিলাম। নদী আর পাহাড়টার মাঝে মস্ত একটা বাওবাব গাছ আছে। ফেরার পথে এই গাছটাকে দেখেই নিশানা ঠিক করতে হবে। পূর্ণিমা চলে গেছে আরুশাতেই। চাঁদ উঠবে সেই অনেক রাতে। তারার আলো আর আমার তিন-ব্যাটারির টর্চই একমাত্র ভরসা। সামনে তাকালে জঙ্গলের মাথার উপরে দিগন্তে কিমিবোওয়াটিঙ্গে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। ঋজুদা বলেছিল, যে পথ ছেড়ে দিয়ে কাল আমরা এসেছি, সেই বড় পথের উপরে জিপটাকে রেখে দিয়ে আসতে। যাতে লোকগুলোর সঙ্গীরা ন্যাশানাল পার্কের লোকেরা তাদের দেখতে

পায়। নইলে হায়নায় আর শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে এদের। শকুনও আছে। যদি এরা কাছাকাছি গাঁয়ের লোক হয় তাহলে কবর পাবে অন্তত। ঋজুদার তো বটেই, আমারও খারাপ লাগছিল ভীষণ। প্রথমেই তিন-তিনটি মানুষ খুন করতে হল। অথচ আমরা নিরুপায়। জঙ্গলের নিয়ম হচ্ছে 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট'। হয় মারো, নয় মরো। মাঝামাঝি রাস্তা এখানে কিছু খোলা নেই।

দুপাশে ক্যাণ্ডালাগ্রা ঝোপ। বড় বড় কম্বিফোরা গাছ। একরকমের কম্বিফোরা আছে তাদের বলে কম্বিফোরা উগোজেনসিস্। হেহেদের মতো গোগো বলে একরকমের আফ্রিকান উপজাতি আছে। তারা যেখানে থাকে সে অঞ্চলকে বলে উগোগো। ঐ অঞ্চলে এজাতীয় কম্বিফোরা বেশি দেখা যায় বলে ঐ গাছের ঐরকম নাম হয়েছে। কম্বিফোরা ছাড়াও কমব্রেটাম, অ্যাকাসিয়া এবং অ্যাডানোসোনিয়া জাতের গাছ আছে। এই অ্যাডানোসোনিয়াই হল বাওবাব। যাদের আরেক নাম "আপসাইড-ডাউন ট্রিজ"। ব্রাকিস্টেগিয়া গাছেদের মতোই বছরের বেশির ভাগ সময়ই এরা পাতাহীন থাকে। কিন্তু বৃষ্টি নামার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এরা বুঝতে পারে যে, বৃষ্টি আসছে। তখন পাতা ছাড়তে থাকে। বৃষ্টির জল যাতে সারা বছরের মতো ধরে রাখতে পারে। প্রকৃতি যে কত রহস্যই গোপন করে রাখেন তাঁর বুকের মধ্যে, তার খোঁজ কজন রাখে?

ন্যাড়া-মুখের কতগুলো 'গো-অ্যাওয়ে' পাখি গাছের ডাল বেয়ে কাঠবিড়ালির মতো দৌড়ে উপরে উঠে গেল জিপটা দেখে। এদের গায়ের পালক হালকা ছাই আর সাদাটে-সবুজ রঙের হয়। এরা হচ্ছে টুরাকো জাতীয় পাখি। সামনেই একটা নাম-না-জানা গাছের নীচে প্রকাণ্ড একটি ইল্যাণ্ড ছবির মতো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরা হরিণ নয়। অ্যান্টিলোপ। সোয়াহিলিতে এদের বলে পফু। লম্বাতে প্রায় ৬' ফিটের মতো হবে। ওজনেও কম করে সাত কুইন্টল হবে কম-সে-কম। জিপ দেখেও ইল্যাণ্ডটা পালাল না। একটু নড়েচড়ে উঠল শুধু। ওর পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন দেখি, কে বা কারা শটগান দিয়ে গুলি করে তার চোখদুটোকে খতম করে দিয়েছে। বুকেও একটা দগদগে ক্ষত। এক্ষুনি হয়তো পড়ে মরে যাবে। যারা এমন নৃশংস হতে পারে, তাদের মেরে

ঋজুদা কিছুই অন্যায় করেনি। মনটা একটু হালকা লাগতে লাগল।

ঋজুদা প্রায়ই একটা কথা বলে। চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াসের কথা। বলে, "ইফ উ্য পে ইভিল্ উইথ গুড, হোয়াট টু য়্যু পে গুড উইথ?" আমাদেরও এরকম কথা আছে, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। যে শঠ, তার সঙ্গে শঠতা করলে দোষ নেই। যে মন্দ, তাকে মন্দ ব্যবহারই দিতে হয়। আর ভালকে ভাল।

ঘণ্টা-দুয়েক জিপ চালিয়ে আসছি। কেবলই ভয় হচ্ছে, রাস্তা হারালাম না তো! ফিরতে পারব তো পথ চিনে? এদিকে সেই বড় রাস্তাও একেবারে বেপাত্তা।

জিপটা একটু আড়াল দেখে দাঁড় করালাম। পিঠের রাক্-স্যাক্ থেকে ম্যাপটা বের করে দেখলাম। কম্পাসটা বের করে তার সঙ্গে মিলিয়ে মনে হল আমি যেন অনেকই বেশি চলে এসেছি ইবিগুজিয়া নদীর দিকে। সর্বনাশ হয়েছে। আমাকে কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে তো নির্ঘাত ফাঁসিতে লটকে দেবে। আইন নিজের হাতে নেওয়ার অধিকার কারোই নেই।

এমন সময় হঠাৎ একটা জিপের শব্দ কানে এল।

হৃৎপিণ্ডর ধুকধুকানি থেমে গেল আমার। কম্পাস আর ম্যাপ উঠিয়ে নিয়ে একদৌড়ে গিয়ে আমি ঝোপঝাড়ের ভিতরে লুকিয়ে পড়লাম। আস্তে আস্তে জিপের এঞ্জিনের শব্দটা জোর হল। বিজাতীয় ভাষায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে কারা যেন আসছে জিপ চালিয়ে। মড়ার মতো নিস্পন্দ হয়ে দেখতে লাগলাম আমি। লোকগুলো আফ্রিকান। ভাগ্য ভাল যে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে রাখা জিপটাকে অথবা আমাকে ওরা কেউই নজর করল না। জিপটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তার শব্দ পর্যন্ত মরে গেল : পেট্রল-ইঞ্জিনের উৎকট গন্ধ, জীপের চাকায়-ওড়া ধুলোর গন্ধ, সব কিছু বুনোফুলের গন্ধে আবার চাপা পড়ে গেল। আমি বেরিয়ে এসে জিপটা যেখান দিয়ে গেল, সেখানে কোনো পথ আছে কি না দেখতে গেলাম। সর্বনাশ! এইটেই ত' বড় পথটা! যে-কোনো মুহূর্তে এখানে ন্যাশনাল পার্কের গাড়ি অথবা বুকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টুরিস্টভর্তি ভোক্সওয়াগন কম্বি, অথবা ল্যাণ্ডরোভার অথবা জিপ এসে

উপস্থিত হতে পারে।

ফিরে গিয়ে লোকগুলোর দিকে তাকালাম। সেই দৈত্যর মতো দেখতে, মাথায় পালক-গোঁজা আফ্রিকান লোকটি মুখ হাঁ করে রয়েছে। আর একটা নীল জংলি মাছি তার মোটা কোলাব্যাঙের মতো ঠোঁটের উপর উড়ে উড়ে বসছে। হাত-পা ছড়িয়ে জমাট-বেঁধে যাওয়া মেটের মতো রক্তের থকথকে রক্তের মধ্যে ওরা তিনজনে শুয়ে আছে। আমার বমি পেতে লাগল। তাড়াতাড়ি স্টিয়ারিং-এ বসে জিপটা চালিয়ে বড় রাস্তার উপর এনে দাঁড় করালাম। তারপর রাক্-স্যাক্ থেকে কাগজ বের করে ভটকাইয়ের প্রেজেন্ট-করা উইলসন কোম্পানির একটা বলপয়েন্ট পেন দিয়ে বড় বড় করে ইংরিজিতে লিখলাম : চোরা-শিকার যারা করবে তাদের এই শাস্তি। চোরাশিকারিরা সাবধান। নীচে লিখলাম : বুনো জানোয়ারদের দেবতা—টাঁড়বারো।

'টাঁড়বারো' আসলে আমাদের দলের কোড নেম। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা, প্রেসিডেন্ট নিয়েরেরই জানেন শুধু। এবং জানেন, পুলিশের বড়কর্তা।

লেখা শেষ হতে বনেটের উপর একটি পাথর চাপা দিয়ে কাগজটিকে টানটান করে মেলে রেখে ওখান থেকে তোঁ-দৌড় লাগালাম আমি। ওদের একজনেরও রাইফেল বা বন্দুক আমাকে নিতে মানা করেছিল ঋজুদা। কিন্তু এতখানি পথ আমাকে একা ফিরতে হবে। পথ ভুলে যাব কি না তারও কোনো ঠিক নেই। শুধুমাত্র পিস্তল সম্বল করে যেতেও মন সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু কী করব? ঋজুদার কথা অমান্য করার সাহস ছিল না।

শেষবারের মতো একবার ওদের দিকে তাকিয়ে, কেওড়াতলায় যখন শব নিয়ে যায় হরিধ্বনি দিয়ে, তখন পথে পড়লে যেমন নমস্কার করি, তেমনই হাত তুলে মৃতদের শেষ নমস্কার জানিয়ে টিকিয়া-উড়ান দৌড়লাম। এখন জিপটা থেকে নিজেকে যত তাড়াতাড়ি এবং যত দূরে সরিয়ে নিতে পারি, ততই মঙ্গল। তবে বড় রাস্তাতে চোরাশিকারিরা আসবে না কোনোমতেই। এলে আসবে গেম-ওয়ার্ডেন এবং টুরিস্টরা। লোকগুলোকে না মেরে অন্তত একজনকেও ধরতে পারলে তাদের ঘাঁটি কোথায় তা জানা যেত। কিন্তু লোকগুলো যে আমাদের মারতেই

এসেছিল। ইরিঙ্গা অথবা ইবিণ্ডজিয়া থেকেই আমাদের পিছু নিয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে!

অনেকক্ষণ দৌড়ে যখন হাঁফিয়ে গেলাম তখন একটা গাছতলায় বসলাম একটু। ঘেমে-যাওয়া গায়ে শীতের হাওয়া লাগতে খুব আরাম লাগছিল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম। মিনিট-পনেরো না জিরোলে চলবে না। কয়েক ঘন্টার মধ্যে এত সব গা-শিউরানো ঘটনা ঘটে গেল যে বলার নয়। এদিকে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে।

জঙ্গলের, বোধহয় পৃথিবীর সব জঙ্গলেরই, একটা নিজস্ব গায়ের গন্ধ আছে। সেই গন্ধ দিনে ও রাতের বিভিন্ন প্রহরে, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন। যার নাক আছে, সেইই শুধু তা জানে। বিভূতিভূষণ তাঁর বিভিন্ন লেখাতে বাংলার পল্লীপ্রকৃতির শরৎকালের গায়ের গন্ধর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, শরতের "তিক্ত-কটু-গন্ধ"। কী দারুণ যে লিখেছেন। শরতের আসন্ন সন্ধ্যায় ভারতের সমস্ত বনের গা থেকেই ঐ রকম গন্ধ বেরোয়। শীত, নিঃশব্দে নেমে আসে কাঁধের দুপাশে—এসে দুকান মোচড়াতে থাকে। আর নাক ভরে যায় তিক্ত-কটু-গন্ধে। কোথায় বিভূতিভূষণের বারাকপুর আর ঘাটশিলা, ধারাগিরি আর ফুলডুংরি আর কোথায় এই কৃষ্ণ মহাদেশের কুম্মাহা। অথচ কত মিল, অমিলের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে ছন্দোবদ্ধ হয়ে জড়িয়ে আছে একে অন্যকে। আমি তো এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এলাম আফ্রিকাতে। বিভূতিভূষণ তো একবারও আসেননি। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ছেড়ে পূর্ণিয়া আর সিংভূমের সারাণ্ডার জঙ্গলেই ঘুরেছেন বার বার। কিন্তু লবটুলিয়া বইহার, মহালিখাপুরের পাহাড়, সরস্বতী কুণ্ড, কুন্তী, রাজা দোবরু পান্না—এসব প্রাকৃতিক চিত্র ও চরিত্র সকলে কি আঁকতে পারেন? আর 'চাঁদের পাহাড়'? বাঘা-বাঘা লেখকরাও বারে বারে আফ্রিকাতে এসেও আর একখানি 'চাঁদের পাহাড়' কি লিখতে পারবেন?

'চাঁদের পাহাড়' বলে সত্যিই কিন্তু একটি পাহাড় আছে এখানে। রুয়েঞ্জরি রেঞ্জে। পাহাড়টির ছবি দেখেছি আমি ঋজুদার কাছে। 'মাউন্টেইন অব দ্য মুন'।

একদল স্টার্লিং পাখি ডাকছে, উড়ছে, বসছে। রোদ চমকাচ্ছে ওদের

ডানায় ডানায়। শীতের দুপুরের নিবিড়, নিথর, ভারী গন্ধ চারিয়ে যাচ্ছে ওদের ওড়াউড়িতে। ভারী ভাল লাগছে।

কিন্তু আর সময় নেই। উঠে পড়ে, কিমিবোওয়াটিজে পাহাড়শ্রেণীর দিকে একবার পিছন ফিরে দেখে, টেডিমহম্মদ পাহাড়টা কোন দিকে হবে আন্দাজ করে নিয়ে রওয়ানা হলাম। আধঘন্টা পরে আবার ম্যাপ খুলে কম্পাস্ বের করে পথ শুধরে নিতে হবে।

আমাদের দলের কোড নেমও কিন্তু বিভূতিভূষণের উপন্যাস 'আরণ্যক' থেকে নেওয়া। "টাঁড়বারো" হচ্ছেন বুনো মোষদের দেবতা। যারা মোষ শিকার করতে আসে টাঁড়বারো তাদের ব্যর্থ করেন মোষদের শিকারীর বন্দুকের কাছে না যেতে দিয়ে। দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন বনপথে। অলগারনন ব্ল্যাকউডের বইয়েও ছোট্টবেলায় এরকম এক দেবতা বা আধিভৌতিক ব্যাপারের কথা পড়েছিলাম। একজন 'মুক্ত' শিকারী তাঁর কোপে পড়েছিলেন। আমাদের ঋজুদার বিশেষ পরিচিত লালজি—প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই, হাতিদের দেবী "সাহানিয়াকে" দু-তিনবার দেখেছেন নাকি। সেই দেখার কথা ওঁর সম্বন্ধে লেখা 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' বলে একটি বইয়ে উল্লেখও আছে। সাহানিয়া দেবী অল্পবয়সী একটি সুন্দরী নেপালী মেয়ে। কথা বলেন না, হাসেন শুধু। ঋজুদা এখানে আসার কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গের বামনপোখরি ও গোরুমারা স্যাংচুয়ারির কাছে মূর্তি নদীর পাশে লালজির এখনকার ক্যাম্পে গেছিলেন। লালজি নাকি ঋজুদাকে বলেছেন যে, ওঁর ধারণা ঐ নেপালী মেয়েটি রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর 'জঙ্গল বুক'-এর মোগলিরই মতো, হাতিদের দ্বারা ছোট্টবেলা থেকে পালিত কোনো নেপালী মেয়ে। একবার যাব লালজিকে দেখতে ঋজুদার সঙ্গে, ইচ্ছে আছে।

আর সাহানিয়া দেবী? দেখা কি দেবেন আমাকে?

কম্পাস বের করে একবার দেখে নিলাম ঠিক যাচ্ছি কি না। যে-নদী চলে গেছে টেডি মহম্মদ পাহাড়ে, আমাদের ক্যাম্প তার পাশ দিয়ে। নদীরেখা ধরে হেঁটে গেলে বাওবাব গাছটা এবং পাহাড়টা চোখে পড়বেই। আশা করি। দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছতেই হবে। খুব জোরে হাঁটতে লাগলাম।

॥ ৭ ॥

এই গুহার ক্যাম্পে দুদিন হল। দু' রাতও। আজ তৃতীয় রাত।

আমরা তিনজনেই রোজ সকালে উঠে তিন দিকে চলে যাই, আগ্নেয়াস্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত হয়ে। জলের বোতল এবং কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে। গলায় বাইনাকুলার ঝুলিয়ে। সারা দিন স্কাউটিং করে বিকেলের আগেই ফিরে আসি। তিনজনের নোটস্ মিলিয়ে দেখি সন্ধেবেলায়। ঋজুদা বলেছে যে, কাল সকালে একটা জিপ নিয়ে একা চলে যাবে। আমি আর তিতির থাকব এই গুহার ক্যাম্পে। তিতির এবং ঋজুদা দুজনেই এ দুদিনে লক্ষ করেছে যে, সার-সার কুলিরা মাথায় এবং কাঁধে বোঝা নিয়ে কিমিবোওয়াটিঙ্গে পাহাড়-শ্রেণীর দিকে চলেছে। তিতির আগুনের ধোঁয়াও দেখেছে আরও উত্তরে। ওখানে নিশ্চয়ই পোচারদের ক্যাম্প আছে।

এই দুদিনেও যখন কেউই আমাদের গুহার দিকে আসেনি, ওদের দলের তিনজন লোকের গুলিতে মৃত্যুর পরও, তখন ঋজুদার অনুমান এইই যে, চোরা-শিকারীরা আমরা যে এখানে আছি, সে-খবর পায়নি। এবং খুব সম্ভব পাবেও না।

ঋজুদা চলে গেলে, আমাকে আর তিতিরকে সবসময়ই একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে হবে। ঋজুদার অর্ডার।

কালকে বিকেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আমরা যখন তিনজনে তিন দিক থেকে ফিরে আসছি তখন আমরা তিনজনই আমাদের ফেরার পথে নানা রকম জিনিস কুড়িয়ে পাই। জংলী জিনিস নয় কিন্তু। সবগুলি জিনিসই বোধহয় একজন শহুরে লোকেরই ব্যবহারের জিনিস। ব্যাপারটা রহস্যময়। দামি একটা রুপোর কাফ্‌পায় তিতির। তার উপরে এনগ্রেভ করা ছিল মালিকের নামের ইনিশিয়ালস্। ইংরেজিতে লেখা ছিল, এস· ডি·

আমি পাই একটি ছুরি। আমেরিকান। রেমিংটন কোম্পানির। ফার্স্টক্লাস ছুরি। পাওয়ামাত্রই কোমরের বেল্টে ঝুলিয়েছি। তার হাতির দাঁতের বাঁটেও লেখা ছিল এস· ডি·

আর ঋজুদা পেয়েছে প্যারিসের ক্রিশ্চিয়ান ডায়রের দুর্মূল্য সুগন্ধি-মাখা একটি সাদা কিন্তু ভীষণ নোংরা রুমাল। তারও এক কোনায় হালকা নীল

সুতোয় লেখা ছিল এস· ডি·

রুপোর কাফ্‌-এ কী একটা তরল পদার্থ ছিল। ঋজুদা গন্ধ শুঁকে তারপর একটু ঢেলে ফেলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমাদের দিকে। আমরাও সেই লাল পানীয়র দিকে বোকার মতো তাকালে ঋজুদা নিজের মনেই বলেছিল, "আশ্চর্য!"

"কেন? আশ্চর্য কেন?"

আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঋজুদা বলেছিল, "লণ্ডনের বেইজওয়াটার স্ট্রিটে একটি ছোট্ট অস্ট্রিয়ান রেস্তোরাঁতে খেতে গেছিলাম আমার এক নৃতত্ত্ববিদ বন্ধুর সঙ্গে। সেখানে আলাপ হয়েছিল অন্য একজন নৃতত্ত্ববিদের সঙ্গে। তাঁর নাম আজ আর মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে, তিনি পুব-আফ্রিকার রিফট্-ভ্যালিতে ডঃ লিকি এবং মিসেস লিকির নেতৃত্বে কিছু কাজ করেছিলেন। কত লোকের সঙ্গেই তো আলাপ হয়। কিন্তু মনে থাকার মতো তো সকলে নন। ভদ্রলোকের তরুণ বয়স, সুন্দর চেহারা এবং একটা অস্বাভাবিক অভ্যেসের কারণে ওঁকে মনে আছে এখনও। উনি কখনও জল খেতেন না। সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। অনেক ইউরোপিয়ানই জল খান না। কিন্তু উনি স্প্যানিশ ওয়াইন এবং তাও একটিমাত্র বিশেষ ব্র্যাণ্ডের ওয়াইন খেতেন সব সময়। আমার বন্ধুই বলেছিলেন, অন্য কোনোরকম পানীয় তিনি ছুঁতেনই না। সেই পানীয়র নাম "বুলস্ ব্লাড"। সে রাতে ওঁর অনুরোধে আমিও খেয়েছিলাম। ভাল, তবে দারুণ কিছু একটা নয়।"

"কী বললে? ষাঁড়ের রক্ত? বুলস্ ব্লাড!"

তিতির বলেছিল।

"হ্যাঁ। এই অদ্ভুত নামের জন্যই পানীয়র কথাটা মনে আছে এতদিনের ব্যবধানেও। আমার বন্ধু ওঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তুমি তো একাই একটা ওয়াইন কোম্পানিকে বড়লোক করে দিলে হে।"

"তোমার সঙ্গে কি তাঁর পুব-আফ্রিকার চোরা-শিকারি বা অন্য কোনো ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল?"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ঋজুদাকে।

"মনে করতে পারছি না। বোধহয় হয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ওঁকে বলেছিলাম যে, লেক লাগাজার কাছে আমি সিলিকার মতো কিছু দেখেছিলাম এবং গোরোংগোরো ক্রাটারের একটি জায়গার মাটি দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, ওখানে হেমাটাইট বা ডোলোমাইট থাকলেও থাকতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরিষ্কার মনে পড়ছে—বলেছিলাম।"

"বললে কেন? উনি তো ভূতত্ত্ববিদ নন। নৃতত্ত্ববিদ।"

"বলেছিলাম এমনিই গল্পে গল্পে। এও বলেছিলাম যে, কৃষ্ণ মহাদেশ আফ্রিকার জায়েরেই খনিজ পদার্থ বেশি পাওয়া যায় বলে জানে লোকে। আসলে আফ্রিকা এত বড় দেশ এবং এত কিছু লুকিয়ে আছে এর অনাবিষ্কৃত বিস্তৃত বুকের ভিতরে যে, একদিন আফ্রিকা পৃথিবীর সব চাইতে বেশি শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠবে। যদি তার আগেই পারমাণবিক বোমাতে পৃথিবী ধ্বংসে না হয়ে যায়।

"বলেছিলাম বটে। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে মানুষটির কোনো ইনটারেস্ট ছিল বলে মনে হয়নি।"

আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। কাল আমি ছোট্ট একটি বুশবাক্ মেরেছিলাম। ঋজুদার সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে। যতদিন সম্ভব আওয়াজ না করে পারা যায়। সেটাকে স্মোক্ করে নিয়েছি শুকনো খড়-কুটো আর ক্যাকটাই পুড়িয়ে। এখন প্রচণ্ড শীতও। পলিথিনের ব্যাগে মুড়ে রেখে দিয়েছি। আমাদের কুক তিতির সুন্দর করে কেটে রোস্ট করে দেয়। স্যাণ্ডউইচও করে। কিন্তু নিজে খায় না। বলে, বোটকা গন্ধ।

গুহার মুখে, পাথরের আড়ালে বসে ছিলাম। যাতে আমার শিলুট দেখা না যায়। টুপি ও জার্কিন চাপিয়ে। পাশে লোডেড রাইফেল রেখে। প্রথম রাতটা আমার পাহারার পালা। শেষ রাতে ঋজুদা। তিতিরকে আপাতত রেহাই দেওয়া হচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে আদিগন্ত আকাশে তারারা চাঁদোয়া ধরেছে মাথার উপর। হাতির দল চলা শুরু করেছে। খুব আওয়াজ করে হাতিরা। যখন দলে থাকে। শুঁড় দিয়ে ডালপালা ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ তো আছেই। পেটের ভিতরেও নানা রকম আওয়াজ হয়। অত বড় বড় পেট তো! যজ্ঞিবাড়ির উনুনের মতোই, তাতে সবসময়ই হজমের প্রক্রিয়া চলছে।

অত বড় ব্যাপার, আওয়াজ তো একটু-আধটু হবেই। খলবল্, ছলছল্ পকাত্—নানারকম মজার মজার আওয়াজ হয় ওদের পেটের মধ্যে।

আমাদের দেশের আকাশের তারাদের কিছু কিছু চিনি। আফ্রিকা তো অনেকই পশ্চিমে। তাই আমাদের দেশের আকাশে বছরের এই সময় যা দৃশ্য, আফ্রিকার আকাশের দৃশ্য তার চেয়ে একটু আলাদা। ঝকঝক করছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। কত নাবিক, কত বিজ্ঞানী, কত পর্যটক এই তারামণ্ডলী দেখে পথ চিনে নিয়েছেন সৃষ্টির প্রথম থেকে। দেখতে পাচ্ছি, পুবে মরীচি। পশ্চিমে ক্রতু। মধ্যে পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাত ঋষির সাতজন স্ত্রী। তিতির জানত না। ওকে কাল বলেছিলাম সে-কথা। স্ত্রীদের নাম সন্ততি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতি এবং লজ্জা। সাত ঋষির স্ত্রীদের দেখা যায় কৃত্তিকাতে। কিন্তু খালি চোখে এবং সহজে অরুন্ধতিকে দেখা যায় না। কৃত্তিকার মধ্যে অরুন্ধতীই সবচেয়ে বিদুষী এবং খুব বড় তাপসী। অরুন্ধতী কৃত্তিকার মধ্যে না-থেকে রয়েছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলেই। তাঁর মহাপণ্ডিত তাপসশ্রেষ্ঠ স্বামী বশিষ্ঠের পাশে। একটি ছোট্ট তারা হয়ে।

আকাশের তারাদের নিয়ে কত সব সুন্দর সুন্দর গল্প আছে আমাদের দেশে। কী সুন্দর সুন্দর সব নাম তাদের। আমার ইংরেজি নামগুলো ভাল লাগে না। বাংলা নামগুলো সত্যিই ভারী সুন্দর। তন্ময় হয়ে তারা দেখতে দেখতে পটভূমির ভয়াবহতার কথা পুরোপুরি ভুলেই গেছিলাম। এই-ই আমার দোষ। এই জন্যেই মা ঠাট্টা করে বলেন কপি-কদ্র। ভিড়ের মধ্যে থেকেও মনে মনে কোথায় যে উধাও হয়ে যাই মাঝে মাঝে।নিজেই জানি না।

হঠাৎ নীচ থেকে কে যেন হেঁড়ে গলায় বলল, "হেই কিড্। ডোনট্ শুট। হোল্ড ইওর গান্।"

ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। ভয়ও পেলাম কম না।

কার এত দুঃসাহস যে, আমাকে কিড্ বলে? আর আমার চোখ এড়িয়ে গুহার নীচে মানুষটা এলই বা কী করে? ওর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রাইফেল তুলেছিলাম আওয়াজটার দিকে। ব্যারেলের সঙ্গে লাগানো টর্চের বোতাম টিপতে গিয়েও কী ভেবে টিপলাম না। বললাম, "হ্যাণ্ডস্

আপ্।"

লোকটা তেমনিই হেঁড়ে ডোন্ট-কেয়ার গলায় হেসে উঠল। অন্ধকারে পাহাড়ের গুহায় গুহায় তার হাসি খাঃ খাঃ খাঃ করে আমাকে অপমান করতে লাগল।

আবার বললাম, "হ্যাণ্ডস্ আপ। উা লাউজি ফুল্।"

লোকটা তবুও হাসি থামাল না। বলল, "মাই হ্যাণ্ডস্ ফুল্। উা বিয়্যাল ফুল্।"

বলেই বলল, "টাঁড়বারো।"

দেখেছ! কী ইডিয়ট, কোড ওয়ার্ডটা আগে তো বলবে। যদি ইতিমধ্যে গুলি করে দিতাম!

"টাঁড়বারো"কথাটা অদ্ভুত শোনাল ওর মুখে—অনেকটা 'ঠাঁশবাড়ো' গোছের।

আমিও বললাম, "টাঁড়বারো।"

বলেই, রাইফেল নামিয়ে নিলাম।

ততক্ষণে ঋজুদা ও তিতিরও বাইরে এসে পড়েছে। ওরা বোধহয় এতক্ষণ আড়ালে থেকে কথাবার্তা শুনছিল।

তিতির লাফাতে লাফাতে নীচে নামতে লাগল আমার পেছন পেছন, সোয়াহিলীতে কী যেন বলতে বলতে, ডামুর প্রতি।

ডামু হেঁড়ে গলায় হেসে আমাদের দুজনের পিঠে দুই বিশাল সিক্কার থাপ্পড় কষিয়ে বলল, "ওয়াটোটো ওআংগু ওআভাগো।" অর্থাৎ, 'ওরে আমার ছেলেমেয়েরা!'

খুক্কুমুনু, পুদ্দুমুনুটা আর বলল না।

ঋজুদা গুহার মুখেই বসে পাইপ খাচ্ছিল। ওখান থেকে বলল, "ডামু, তোমার সঙ্গের বন্ধু এতক্ষণ কী খাচ্ছিল? জল?"

"হি ড্রিঙ্কস নো ওয়াটার। হি ড্রিঙ্কস সামথিং রাঙ্গি ইয়াকে নিয়েকুণ্ডু কামা ডামু।" মানে, যার রক্ত রক্তের মতো লাল।

ঋজুদা সঙ্গে সঙ্গে রুপোর ফ্লাস্কটা হাতে নিয়ে দৌড়ে নেমে এল। ডামুর পাহাড়প্রমাণ শরীরের পেছনে যে অন্য একজন লোক হাত-পা পিছমোড়া অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে তা আমরা কেউই এতক্ষণ লক্ষ করিনি।

ঋজুদার সঙ্গে আমরাও তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। লোকটার নাক ফেটে রক্ত পড়ে শুকিয়ে কশ বেয়ে জমে ছিল। ডামু বোধহয় ঘুষিটুসি মেরেছে। আমাদের দেখেই লোকটা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। ঋজুদার দিকে বোকা-বোকা চোখে তাকিয়ে থাকল।

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, "কী নাম আপনার?"

"সাগেসিন ডবসন।"

"হুঁ।"

লোকটি এবার হাসল ঋজুদার দিকে চেয়ে। ইংরেজিতে বলল, "আমাকে চিনতে পারলে না মিস্টার বোস? সেই লণ্ডনের টিকলার হট্ রেস্তোরাঁতে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, টম ম্যাক্আইভর-এর সঙ্গে। মনে পড়ে? চার-পাঁচ বছর আগের কথা।"

"মনে পড়ে। কিন্তু আপনি এখানে কী করছিলেন?"

"সেইই ত। সেই কথাই ত বলতে চাইছি। কিন্তু শুনছে কে? আপনিই তো বলেছিলেন লেক লাগাজাতে সিলিকা, রিফ্ট ভ্যালিতে হেমাটাইট্ ডলোমাইট্; সেই অবধি প্রফেসর লিকির সঙ্গে সব সংস্রব ছেড়ে দিয়ে এইই করে বেড়াচ্ছি। হি-হি।"

লোকটা ল্যাজেগোবরে অবস্থাতেও স্মার্ট হবার চেষ্টা করল। নাকে ঘুষি খাওয়াতে সব শব্দের আগে একটি করে চন্দ্রবিন্দু অনিচ্ছাকৃতভাবে যোগ হয়ে যাচ্ছিল।

ডামু হঠাৎ ওর পিছনে অসভ্যর মত এক লাথি মেরে লোকটাকে উল্টে ফেলে দিল। পড় তো পড় একেবারে নাক নীচে করেই। হাউমাউ করে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কেঁদে উঠল লোকটা।

ঋজুদা বাংলায় বলল, "রুদ্র, ওকে খেতে দে। তবে ও এখানেই থাকবে। একটা ত্রিপল বের করে দে গাড়ি থেকে। বাঁধনও খুলবি না। ডামুকে বলছি, যেন আর মারধোর না করে।"

এই বলে ডামুকে নিয়ে গুহার দিকে উঠে গেল ঋজুদা।

আমি লোকটাকে সোজা করে বসালাম। তিতির গেল ওর জন্যে খাবার আনতে। আমি যখন জিপ থেকে ত্রিপল নামাচ্ছি তখন লক্ষ

করলাম, লোকটা এক দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকিয়ে আছে। রোগা-পটকা একজন জ্ঞানী-গুণী সাহেব। দেখে মনে হয়, প্রফেসর বা কবি। ঋজুদা এর উপর বিশেষ প্রসন্ন নয় বলে মনে হল। আমার কিন্তু মায়া হল ভদ্রলোককে দেখে। কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে ঋজুদার।

তিতির খাবার নিয়ে এসে বলল, "এইভাবে একটা মানুষ এই ঠাণ্ডায় বাইরে পড়ে থাকতে পারে? তাছাড়া, সিংহ বা চিতা খেয়ে নেবে যে।"

"পাহারায় তো থাকবই কেউ না কেউ। তাছাড়া আমি কী করব! ঋজুদার অর্ডার।"

তিতির জল দিয়ে ওর নাক মুছে দিল। তারপর খেতে দিল। গাণ্ডেপিণ্ডেই খেলেন মিস্টার ডবসন। ধন্যবাদ দিলেন আমাদের। তারপর হাউমাউ করে মেয়েদের মতো কাঁদতে লাগলেন।

তিতির বলল, "ঋজুকাকা নিশ্চয়ই ভুল করছে। এ লোকটা খারাপ হতেই পারে না।"

আমারও ত' তাইই মনে হচ্ছে। কিন্তু ঋজুদাকে কে বলবে বল যে, সে ভুল করছে? এদেশে মানুষ বড় হয়ে গেলে, তার নামডাক হয়ে গেলে, গর্বে বেঁকে গিয়ে তারা ভাবে যে, সে আর গুলওয়েজ রাইট, ইভন্ হোয়েন সে আর রং।

ঋজুদা কিছুক্ষণ পর নেমে এল। ডামু বোধহয় জমিয়ে খাচ্ছে। ওর গল্প শুনতে হবে। কী কী হল পথে? কেমন করে ও এল? এই ডবসনকেও বা জোটাল কেমন করে?

তিতির বলল, "ঋজুকাকা, তুমি বোধহয় লোকটার প্রতি অন্যায় করছ!"

ঋজুদা বলল, "হয়তো করছি।"

আমার দিকে ফিরে বলল, "রুদ্রবাবুরও কি তাই-ই মত?"

আমি চুপ করে রইলাম।

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, "বুঝেছি। লোকটা যে সাহেব! সাহেবি পোশাক পরনে। অক্সোনিয়ান্ অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলে, সুতরাং সে কি আর চোর হতে পারে, না মিথ্যেবাদী? এই সায়েব-ভীতি এবং প্রীতিতেই বাঙালি জাতটা গেল। যে-কেউ যদি চোস্ত ইংরেজি বলে বা

কারো পিঠে চাপড়ায় অমনি তোরা তাকে পুজো করতে লেগে যাবি। আমি যা বলছি, তাই-ই হবে। আমার কথার উপর কথা নয় কোনো। ডবসন এই বাইরেই পড়ে থাকবে।"

তিতির বলল, "সিংহে হায়নায় খেয়ে নেবে যে!"

"নিলে নেবে।"

"এ কী রে বাবা!"

তিতির স্বগতোক্তি করল।

ঋজুদা উত্তর না দিয়ে ডবসনকে সায়েবদেরই মতো ইংরেজিতে বলল, "আপনার কাগজপত্র আমি দেখলাম। আপনার জীবনের ভয় নেই কোনো। খেতে-টেতেও পাবেন। সকালে আধ ঘণ্টার জন্য আপনার দড়ি খুলে দেওয়া হবে। বিকেলেও তাই। পালাবার চেষ্টা করবেন না। পালাবার চেষ্টা করলেই মেরুদণ্ডে গুলি খাবেন।"

"মিস্টার বোস! আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না! আপনার বন্ধু মিঃ ম্যাকআইভরের আমি এত বন্ধু! আপনি এমন একজন চমৎকার লোক!"

ঋজুদা বলল, "আমি জানি যে, আমি চমৎকার লোক। আপনার সার্টিফিকেটের দরকার নেই আমার।"

তারপর বলল, "আমি ছেড়ে দিলে, ফিরে গিয়ে ফিল্মের সিনারিও লিখবেন। খুব নাটকীয়ভাবে কথা বলতে পারেন আপনি। কিন্তু জীবনে এ-সবের কোনোই দাম নেই।"

ঋজুদা গুহায় চলে গেল ডামুকে নিয়ে। আমি আর তিতির সার্গেসিন ডবসনকে মরা শুয়োরের মতো ত্রিপল চাপা দিয়ে মুখের কাছে একটা বোতল রেখে দিয়ে চলে এলাম।

গুহায় গিয়ে দেখি, ওয়্যারলেস্ সেট সামনে নিয়ে ঋজুদা ও ডামু খুব চিন্তিত মুখে বসে আছে। ন্যাশনাল পার্কের হেডকোয়ার্টার্সে বোধহয় মেসেজ পাঠিয়েছে কোনো। জবাব পাচ্ছে না। ন্যাশনাল পার্ক হেডকোয়ার্টার্স তো আর লালবাজার নয়, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডও নয় যে, সারারাত তারা চোর-ডাকাত-খুনির মোকাবিলা করবার জন্যে হাঁ করে ওয়্যারলেস সেটের সামনে বসে থাকবে!

আমি আর তিতির নীরব দর্শকের মতো ঋজুদা আর ডামুর দিকে চেয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ ক্লিপ্ ক্লিপ্ আওয়াজ আসতে লাগল। ঋজুদা বলল, "টাড়বাড়ো, টাড়বাড়ো।"

ওপাশ থেকে কেউ কথা বলল। হেডফোনে কান লাগিয়ে ঋজুদা উদগ্রীব হয়ে কী সব শুনল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বলল, "থ্যাঙ্কস্ আ লট। রজার।"

তারপর বলল, "তিতির, ডামুকে ভাল করে খাওয়া। রুদ্রকেও। কারণ এর পর কদিন খেতে পাবে না ওরা তার ঠিক নেই।"

আমার খিদে নেই। আমি বললাম, "একটু আগেই তো খেলাম। খামোকা খাব কেন?"

"খেতে বলছি। খাবি।"

"যাঃ বাবা। বমি হয়ে যাবে যে।"

"ঠিক আছে। তবে তোর হ্যাভারস্যাক ঠিক করে নে। খাবার, জল, গুলি, কম্পাস, দুরবিন, যা যা নেবার নিয়ে নে। এবার তোর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ডামু, চিয়ার আপ্।"

ঋজুদার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল, আমি আর তিতির যখন নীচে ছিলাম তখন ডামু আর ঋজুদার মধ্যে কোনো গোপন পরামর্শ হয়েছে।

ঋজুদা বলল, "তোর পিস্তল এবং রাইফেলটাও নিতে ভুলিস না। ডামু তোমারটা কোথায়?"

ডামু বলল, "কোমর ব্যথা হয়ে গেছে। হ্যাভারস্যাকে রেখে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি কোমরকে।"

"বেশ করছ।"

ডামু খাওয়া-দাওয়ার পর ঋজুদার কাছ থেকে চেয়ে একটা নেপোলিয়ন ব্রাণ্ডির বড় বোতল নিয়ে, ঢকঢক করে কিছুটা খেয়ে বোতলটাকে ট্যাঁকস্থ, ধুড়ি, হ্যাভারস্যাকস্থ করল। বলল, "বড়ই ধকল গেছে। শরীরটাকে একটু মেরামত করে নিলাম।"

আমাদের গোছগাছ হয়ে গেলে আমরা সকলে নীচে নেমে এলাম। নীচে এসে ঋজুদা ডবসন-এর কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে ক্ষমা চাইল। তারপর

তার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, "আপনি মুক্ত। এখন আপনি যেখানে যাবেন সেখানেই এরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

"আমি আর যাব কোথায়? আমি তো ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছি। হেমাটাইটের সন্ধানও পেয়েছি। ডোলোমাইটেরও। তাছাড়াও এমন কিছু পেয়েছি যে, শুনলে আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন।"

"কী?"

"ইউরেনিয়াম।"

আমি আর তিতির একসঙ্গে অবাক হয়ে বললাম, ই-উ-রে-নি-য়া-ম্!

"হ্যাঁ।"

ঋজুদা বলল, "তোরা কথা বলিস না, ওঁকে বলতে দে।"

"আপনি জানেন যে, তানজানিয়া কম্যুনিস্ট দেশ। এখানে ইউরেনিয়ামের এত বড় ডিপোজিট আছে তা জানাজানি হয়ে গেলে সারা বিশ্বে হৈহৈ পড়ে যাবে। ভারত মহাসাগরের মধ্যে যে সেশেল্‌স দ্বীপপুঞ্জ আছে তাও কম্যুনিস্ট দেশ।"

আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, "জানি। চমৎকার জায়গা। একেবারে স্বর্গ। আমিও গেছি।"

ঋজুদা ধমকে বলল, "চুপ কর্।" ডব্‌সনকে বলল, "বলুন, কী বলছিলেন।"

"সেই সেশেল্‌স-এর রাজধানী মাহেতে শিগগিরই 'কু্য' হবে। ক্যাপিটালিস্ট দেশরা চাইছে, যেন-তেন-প্রকারেণ সেশেল্‌সকে কব্জা করতে, কারণ আমেরিকার যেমন ডিয়েগো-গার্সিয়া, রাশিয়ারও তেমন সেশেল্‌স। সাবমেরিন আর জাহাজের আড্ডা সেটা। তানজানিয়াতে ইউরেনিয়ামের এত বড় ডিপোজিট আছে জানতে পারলে তানজানিয়ার ওয়াইল্ড-লাইফ-এর চেয়েও তার দাম অনেক বেশি বলে তানজানিয়ানরাও বুঝবে। যেমন বুঝবে রাশিয়া ও আমেরিকা। আমার দুঃখ এই-ই যে, ব্যাপারটা জানাজানি হলেই তানজানিয়ার এই বন্য-প্রাণীদের সর্বনাশ হবে।"

"বাঃ। আপনি দেখছি বন্য-প্রাণীদের মস্ত বন্ধু।"

ডামু বলল উৎকট-গন্ধ সিগারের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

"বন্ধু নয়? কোন্ সহৃদয় মানুষ এদের এই নিধন চোখ বুজে সহ্য করতে পারে?"

"তাহলে আপনি রওয়ানা হন। জিপে করে ছেড়ে দিয়ে আসবে এরা আপনাকে। যেখানে যেতে চান।" ঋজুদা ডব্‌সন-এর কথা থামিয়ে বলল।

"রাতটা আপনাদের সঙ্গেই থেকে যাই না কেন।"

"না, তা হয় না, মিস্টার ডব্‌সন। আপনি ম্যাক্‌আইভরের বন্ধু। তাই আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। নইলে, আমরা যা খুঁজতে বেরিয়েছি, তা আমাদের আগেই আপনি খুঁজে পেয়েছেন; এ কথা জানবার পরও আপনাকে আমাদের বন্দী করে রাখাই উচিত ছিল। তবে আপনার সমস্ত কাগজপত্র ও ম্যাপ যখন আমরা পেয়ে গেছি তখন আপনাকে বন্দী করে রেখে বা প্রাণে মেরে আমাদের লাভ নেই কোনো।"

ডামু বলল, "আপনার কাছে ঐ ম্যাপের কোনো কপি-টপি নেই তো?"

"কপি করার সময় আর পেলাম কোথায়? তার আগেই তো—"

"না পেয়ে থাকলেই ভাল। এখন বলুন, কোথায় আপনাকে ছাড়ব। আমরা আপনার ভাল চাই। যাতে ইয়ালো বেবুনে আপনার কান ছিঁড়ে না নেয়, অথবা হায়নার দল আপনার নাক চোখ খুবলে না নেয়, অথবা সিংহের দল আপনাকে কিমা না করে দেয়, সেই জন্যেই আপনাকে নিরাপদে পৌঁছানোর ব্যবস্থা।"

ডব্‌সন একটুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, "আমার পাসপোর্ট ইত্যাদি তো আমাকে ফেরত দেবেন?"

"নিশ্চয়ই। এই নিন।" বলে ডামু একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল ওঁর হাতে।

"এখানে আপনাদের সঙ্গে থাকলেই কিন্তু আমি নিরাপদে থাকতাম। আমার অনেক শত্রু।"

ডামু বলল, "কিন্তু আমাদের তাতে বিপদ। তাছাড়া আপনিও আমাদের মিত্র নন।"

"ওঃ।"

ডব্‌সন একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তাহলে আমাকে

পার্ক-হেডকোয়ার্টার্সের কাছেই পৌঁছে দিন। সেখানের আধ মাইলের মধ্যে ছেড়ে দিলেই হবে। আপনারা ফিরে আসতে পারেন। আমার সঙ্গে আপনাদের কেউ দেখলে বিপদ হবে আপনাদেরই।"

"আপনি খুব বিবেচক।"

ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, "তাই-ই হবে।"

ইতিমধ্যে ঋজুদার কথামতো তিতির গুহাতে গিয়ে একটা তলায় স্পাইক বা কাঁটা লাগানো জুতো নিয়ে এল। জুতোটা আমারই তা দেখে মেজাজ গরম হয়ে গেল।

ঋজুদা বলল, "আপনার জুতোটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে। ওটাকে ছেড়ে এটা পরে ফেলুন। আপনার পায়ের মাপ নিশ্চয়ই সাত।"

ডবসন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। বললেন, "আশ্চর্য! আপনি..."

পরক্ষণেই বললেন, "ছিঃ ছিঃ, তা কেন, কী দরকার? বেশ তো আছে জুতো জোড়া। আপনাদের জুতো দিয়ে দিলে আপনাদের কষ্ট হবে না! এখনও চলবে কিছুদিন এ জুতোজোড়া। আমাকে দিলে আপনাদের জুতো কমে যাবে না?"

ডামু বলল, "আমরা সবসময়ই যথেষ্ট জুতো নিয়ে চলাফেরা করি। কিছু পরার জন্যে, আর কিছু মারার জন্যে।"

বলেই ডবসনসাহেবকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে বসিয়ে প্রায় জোর করেই তাঁর সরব আপত্তি না-শুনে জুতো-জোড়া তাঁর পা থেকে খুলিয়ে আমার নীরব আপত্তি না-শুনে আমার জুতো-জোড়া তার পায়ে গলিয়ে, ভাল করে ফিতে বেঁধে দিল।

মিস্টার ডবসনের জুতো-জোড়া অদ্ভুত। বেঁটে লোকেরা তাদের লম্বা দেখাবার জন্যে উঁচু হিলের জুতো পরেন বটে, কিন্তু ওঁর জুতো-জোড়া আশ্চর্য। নীচে রাবার। তার উপরে কাঠের খড়মের মতো একটা ব্যাপার—তারও উপরে আবার রাবার।

জুতো-জোড়া খোলার পর ঋজুদা বাংলায় অতি নরম এবং স্বাভাবিক গলায় টেনে টেনে বলল, "রুদ্র তৈরি হয়ে নে। যত্ন বার কর্। এই দুটোই আমাদের যম। এক্ষুনি এদের বেঁধে ফেলতে হবে।" ঋজুদার এই

হঠাৎ-কথাতে মিঃ ডবসন যেন চমকে উঠলেন। ডামুর কোনোই ভাবান্তর হলো না। বাংলায় বলেছিল ঋজুদা।

এমন ভাবে হাসি-হাসি মুখে বাঁ হাতটা ডামুর কাঁধের উপর রেখে কথাগুলো বলল ঋজুদা যে, ডামু দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারল না যে, ওয়ানাবেরিরও বাবা আছে।

ঋজুদা কী যে বলছে, তা যেন আমার মাথায়ই ঢুকল না। ডামু! ওয়ানাবেরি! যম? তবে, তাকে দলে আনা...

তিতির কিন্তু এমন ভাবে ব্যাপারটাকে নিল যেন, কিছুই হয়নি। অবাক হলাম আমি। ডামু কিছু বোঝবার আগেই তিতির তার পিস্তল বের করে ডামুর পিঠে ঠেকিয়ে দিল। ঠেকাতে ঠেকাতেই কক্ করে নিল। আমি টিঙ্‌টিঙে ডবসনের দু-পায়ের গোড়ালির কাছে একটা জব্বর জুডোর লাথি কষালাম। 'ওঃ মাই গড!' বলে ডবসন চিত হয়ে পড়লেন। ওঁর বুকে চেপে বসে আমি পিস্তল ঠেকিয়ে রাখলাম ওঁর গলাতে। ঋজুদা তড়িৎগতিতে নাইলনের দড়ি দিয়ে ডামুর দু-হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

কয়েক সেকেণ্ড ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে রইলেওপ্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডামু ঋজুদাকে এমন এক লাথি মারল যে, ঋজুদা ছিটকে পড়ল দূরে। এবং একই সঙ্গে তার পাহাড়প্রমাণ পেছন দিয়ে এক ধাক্কা তিতিরকে। হালকা-পলকা তিতির চিতপটাং হয়ে ছিটকে গেল কিছুটা। পরক্ষণেই ডামু আমার দিকে দৌড়ে এল হাত-বাঁধা অবস্থাতেই। পাছে, ডবসন উঠে পড়ে, তাই আমি তাড়াতাড়ি ওর বুকের উপর বুট-পরা পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে এক পা বুকে আর এক পা মুখে রেখে চেপে থাকলাম। পিস্তলটা ডামুর দিকে ঘুরিয়ে চিৎকার করে বললাম, "হ্যাণ্ডস্ আপ ডামু।"

কিন্তু ঐ পাহাড়প্রমাণ সাংঘাতিক লোকটা সত্যিই যমদূত। যমের ভয় ওর নেই। ও যখন আমার চিৎকারে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না তখন ওর বুকের বাঁ দিকে নিশানা নিয়ে পিস্তলটা সোজা করে ধরলাম আমি। কোনো জীবন্ত জিনিসকে মারতে আমার কখনই ভাল লাগে না। যদিও শিকার করেছি অনেক, কিন্তু মারবার মুহূর্তে বড়ই খারাপ লাগে। তেলাপোকাকেও মারতে ভাল লাগে না। আর আমারই মতো একজন মানুষকে মারা নিয়ে

কথা। যাকে চিনি, জানি--। কিন্তু আমার নিজের জীবন ছাড়াও তিতির আর ঋজুদার জীবনেরও প্রশ্ন। একবার যদি ও পিস্তলটা আমার হাত থেকে ফেলে দিতে পারে তাহলেই--

ডামুর পিছন থেকে ঋজুদা একটা চিতাবাঘের মতো দৌড়ে আসছিল। দৌড়ে আসছিল না বলে, উড়ে আসছিল বললেই ভাল হয়। তিতিরও তাই। তিতির আর ঋজুদা যেন একসঙ্গেই ওর ঘাড়ে মাথায় এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফটাস করে একটা আওয়াজ হল।

তিতির পিস্তলের নল দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মেরেছে। কিন্তু ঐ সাংঘাতিক সময়েই সেফ্‌সাইড হয়ে গেল। তিতিরের পিস্তলের নল গিয়ে পড়ল ঋজুদার মাথার পেছনে।

'আঃ!' বলে একটা অস্ফুট শব্দ করে ঋজুদা ডামুর পিঠের কাছ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঘটনাটার অভাবনীয়তায় তিতির, 'এ মাঃ, কী করলাম আমি! কী করলাম!' বলে হাতের পিস্তলটা ডামুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে দৌড়ে ঋজুদার কাছে গিয়ে ঋজুদার মাথাটা কোলে নিয়ে বসল।

আমি আতঙ্কিত হয়ে দেখলাম ডামু হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থাতেই পিছন ফিরে পিস্তলটা তুলে নিল। নিয়েই, ক্রিকেটের পেস্-বোলাররা বল করবার সময় যেমন জোরে হাত ঘোরান তেমন করে এক ঝটকাতে জোড়া-হাতকে মাথার উপর দিয়ে সামনে নিয়ে এসে হাতটা আমার দিকে তুলতে লাগল।

অনেক সুন্দর গল্প শুনিয়েছিলে তুমি ডামু। ওয়ানাবেরি-ওয়ানাকিরির গল্প। ভেবেছিলাম, আরও অনেক গল্প শুনব তোমার মুখ থেকে এই উদাম, উন্মুক্ত, কৃষ্ণ মহাদেশের নক্ষত্রখচিত শীতার্ত রাতে। আগুনের পাশে বসে; কিন্তু--

আমার হাতটা তোলাই ছিল, কব্জিটা আর একটু শক্ত করলাম। তরপর তর্জনী দিয়ে ট্রিগারে চাপ দিলাম। আমার শর্ট-ব্যারেল্‌ড পিস্তলের আওয়াজ টেডি মহম্মদ পাহাড়ে আর অন্যান্য পাহাড়ে, রুআহা ন্যাশনাল পার্কের বুকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা মৌন সাক্ষীর মতো বাওবাব গাছেদের নিশ্চল নির্বাক বাকলে পিছলে গিয়ে আবার ব্যুমেরাং-এর

মতো গম্‌গমিয়ে ফিরে এল। ডামু মাটিতে পড়ে যেতে যেতেও জোড়া-হাতে ধরা তিতিরের পিস্তলটা আরেকবার উঁচু করে গুলি করল আমার দিকে। আমার দ্বিতীয় গুলির শব্দের সঙ্গে ওর গুলির শব্দ মিশে গিয়ে অন্ধকার রাতের নীলাভ তারাদের কাঁপিয়ে দিয়ে এবার হায়নার হাসির মতো আদিম আফ্রিকার বুক খান্‌খান্ করে চিরে দিয়ে গেল যেন।

ডামু শেষ কথা বলল জড়িয়ে জড়িয়ে, "হে কিড, ডোণ্ট শুট্।"

ঋজুদা অজ্ঞান হয়ে গেছিল। মরেই গেল কি না, তাইই বা কে জানে! মাথার পিছনে পিস্তলের নলের এমন প্রচণ্ড বাড়ি খেলে মরে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ডামু পড়ে যেতেই ডব্‌সনকে ছেড়ে দিয়ে তিতিরের পিস্তলটা তুলে নিলাম আমি। ডব্‌সন বোধ হয় আমাকে আর তিতিরকে আণ্ডার-এস্টিমেট করেছিলেন। মনে হল, এখন হুঁশ হয়েছে। ওঁকে বললাম, "উঠে চুপ করে বসে থাকুন। নইলে গুলিতে আপনার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

মনে হল, কথাটা উনি বুঝলেন।

ডামুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হিপ-পকেট থেকে টর্চ বের করে ওর মুখে ফেললাম। ভেবেছিলাম, ওকে একটু জল খাওয়াব মরার আগে। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। ভয়ে নয়, আনন্দে নয়; দুঃখে। ভাবছিলাম, আমি কী খারাপ! একটি ছোট মৌটুশকি পাখি, কি একটা প্রজাপতিও তৈরি করতে শিখিনি আমরা, অথচ কত সহজে ডামুর মতো এমন দৈত্যাকার প্রাণোচ্ছল হাঃ হাঃ হাসির একটা মানুষকে মেরে ফেললাম।

তিতির আমাকে জড়িয়ে ধরল। এখন তিতিরের চোখে জল নেই, তিতির এখন আমাদেরই একজন, ও আর শুধু উৎসাহী ছোট্ট, মিষ্টি মেয়েমাত্রই নয়, একজন বুদ্ধিমতী, সাহসী, অ্যাডভেঞ্চারার হয়ে উঠেছে।

"কল্প! তুমি এত ঘামছ কেন, এই শীতে? গরম লাগছে তোমার?"

"গরম? না তো! উত্তেজনায় শরীর গরম হয় বটে কিন্তু ঘামবার মতো তা নয়।"

"তোমার হাতটাও চ্যাটচ্যাট করছে ঘামে।"

"বাঁ হাতে একটু যেন ব্যথা-ব্যথা করছে। কী ব্যাপার বুঝছি না।"

তিতির টর্চ জ্বেলে আমার হাতে ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল। "রক্ত! রক্ত!

হোমার গুলি লেগেছে।"

আমি ভাল করে দেখলাম। ব্যাপারটা ঠাওর মাথায় বোঝবার চেষ্টা করলাম। গুলিটা লেগেছে বটে কিন্তু কনুই আর বগলের মাঝামাঝি বাঁ হাতের বাইরের দিকে ছুঁয়ে গেছে শুধু। হাতের মধ্যে ঢুকলে তিতিরের বলার অপেক্ষায় থাকতে হত না। ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। ঋজুদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমার আঘাতটা যদি গুরুতর হত, তবে ডবসনের হাতে পড়ত তিতির একা।

আমার ব্যথাটা আস্তে আস্তে বাড়ছিল। সুন্দরবনের মাঝিদের কাছে শুনেছিলাম, হাঙরে যখন পা কেটে নিয়ে যায়, তখন নাকি বোঝাই যায় না। বাবার বন্ধু মিলিটারির ব্রিগেডিয়ার মুখার্জিকাকুর কাছে শুনেছি, যুদ্ধে যখন গুলি লাগে, কিন্তু যদি ভাইটাল জায়গায় না লাগে, তখন উত্তেজনার সময় নাকি বোঝাই যায় না। বোঝা যায় পরে।

তিতিরকে বললাম,"বেশী কিছু হয়নি আমার। পরে দেখো। এখন ঋজুদার কাছে যাও।"ডবসনকে আমি পাহারা দিতে লাগলাম আর তিতির লাগল ঋজুদার পরিচর্যায়। মাথার পেছনে ওয়াটার বটল্ খুলে থাবড়ে-থাবড়ে জল দিচ্ছিল ও। ভাবছিলাম, ঠাকুমা এখানে থাকলে শ্বেতপাথরের খল-নোড়াতে মধু দিয়ে মকরধ্বজ মেড়ে খাইয়ে দিত একটু। আর ঋজুদা সঙ্গে সঙ্গে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে পড়ত।

ডবসন, মনে হল, ঘুমিয়েই পড়েছে। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। জানি না, হয়তো চোখ বন্ধ করে মটকা মেরে মড়ার মতো পড়ে কোনো মতলব ভাঁজছে। মিনিট-পনেরো পরে, তিতির বলল, "জ্ঞান আসছে ঋজুকাকার।"

"ভাল।"

অনেকক্ষণ আমরা ডামু আর ডবসনকে নিয়ে ব্যস্ত আছি। ভুলেই গেছি যে, আফ্রিকার এক-নামী ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে রাতের বেশ অন্ধকারে খোলা জায়গায় রয়েছি। কথাটা মনে হতেই আমি বেল্টে ঝোলানো টর্চটা ক্ল্যাম্প থেকে এক টানে খুলে, সুইচ টিপে চারদিকে তাড়াতাড়ি করে ঘুরিয়ে ফেলতেই এক সার লাল-লাল ভুতুড়ে চোখ জ্বলে উঠল। হায়না। হাজারদের হাত থেকে গুগুনোগুম্বারের দেশ থেকে ঋজুদাকে যে কী ভাবে

বাঁচিয়ে এনেছিলাম তা ভগবানই জানেন। চোখে আলো পড়তেই অদ্ভুত একটা আওয়াজ করল একটা হায়না এবং পরক্ষণেই পুরো দলটা গা-হিম-করা হাসি হাসতে হাসতে ছড়োছড়ি করে এ-ওর গায়ে পড়ে একটু সরে দাঁড়াল মাত্র। রক্তর গন্ধ পেয়েছে ওরা। ডামুর তো বটেই, নাক-ফাটা ডবসন ও হাতে-গুলি-লাগা আমারও। সার রাত এখন বাকি। কী যে করব, তা ভেবেই পেলাম না। হায়নার হাত থেকে ডামুর মৃতদেহ বাঁচাব, না নিজেদের? এখানে তো গুলি করা বারণ। যদিও ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকার খান-খান্ হয়ে গেছে গুলির শব্দে।

কিছুক্ষণ পরে ঋজুদা উঠে বসল। উঠে বসেই, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে তিতিরকে বলল, "কনগ্রাচুলেশনস্। মোক্ষম মার মেরেছিলি তুই। শুধু মারখানেওয়ালা ভুল করে ফেলেছিলি। মারটাই আসল, কাকে মারবি সেটা বাহ্য।"

তিতির এবার দৌড়ে গেল গুহাতে। ওষুধপত্র, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি নিয়ে আসতে। তারপর ঋজুদা আর তিতির দুজনে মিলে টর্চ জ্বালিয়ে দেখে, ভাল করে মারকিওক্রম লাগিয়ে, ব্যথা কমার ওষুধ লাগিয়ে, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাইয়ে দিল পটাপট আমাকে। যন্ত্রণাটা আস্তে আস্তে বাড়ছিল। এবার কমতে লাগল। ঠিক যন্ত্রণা নয়, একটা গরম-গরম, জ্বালা-জ্বালা ভাব।

উঠে দাঁড়িয়ে ঋজুদা ডামুর কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, "বেচারা।"

ডবসনের চোখে মুখে মৃত্যুভয়। অন্তত আমার তাই-ই মনে হল। সে কথা বললামও ঋজুদাকে।

"তুইও যেমন! এর জান সেংসি মাছিদের চেয়েও, আমাদের দেশের কচ্ছপের জানের চেয়েও শক্ত। এর কথা বলব তোদের। একে নিয়ে চল গুহাতে।"

"ডামু এখানেই পড়ে থাকবে?"

"হ্যাঁ। ভাল করে ত্রিপল চাপা দিয়ে বেঁধে রাখ। কাল নদীর বালিতে ওকে আমরা কবর দিয়ে যাব। আর রুদ্র যখন পাহারাতে বসবি, পয়েন্ট টু-টু পিস্তল দিয়ে হায়না তাড়াবি। যখনই তারা আসবে।"

হায়নারা তো আসবেই, শেয়ালরাও আসবে। পশুরাজও আসতে

পাচ্ছেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-আত্মা-বাচ্ছা নিয়ে। আমার মনে হয় আমাদের সুখের দিন এবং প্রতীক্ষার দিনও শেষ হয়ে গেছে। কাল থেকে এখানে আর থাকা চলবে না। রাতেও হয়তো টনাডোর দল এসে পড়তে পারে। ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো হেলিকপ্টারে করে লোক পাঠিয়ে এই গুহাসুদ্ধ বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে যাবে।

আমরা ডামুকে ভাল করে ঢেকে-ঢুকে বেঁধে-ছেঁদে গুহাতে এলাম। ডবসন গুহার মধ্যে ছোট্ট আগুনের সামনে পা জড়ো করে আমাদের মতো করেই বসল।

ঋজুদা ডবসনের বুটের গোড়ালির মধ্যে থেকে পাওয়া ম্যাপ এবং অন্যান্য কাগজপত্র বের করে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দেখা হয়ে গেলে মুখ তুলে বলল, "ডামুকে কত টাকা দেবেন বলে লোভ দেখিয়েছিলেন? আর এমন নাটকীয়ভাবে দুজনের একসঙ্গে আসাটার প্ল্যানটা কার?"

ডবসন গলা-খাঁকারি দিল একবার।

"আমাদের সময় নেই, সময় নষ্ট করবার। সোজা কথা, সোজা করে, তাড়াতাড়ি বলুন।" ঋজুদা বলল।

"ফিফটি-থাউজ্যাণ্ড তানজানিয়ান শিলিং। দুজনের একসঙ্গে আসার প্ল্যানটা আমারই।"

"একটা লোক সৎপথে ফিরে এসেছিল প্রায়, তাকে আবারও ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন আপনারা! টনাডো, ভুসুগুদের কথা বুঝি। কিন্তু আপনার মতো মানুষও! ভাবা যায় না। অবশ্য আমাকে সাহায্য করার অপরাধে আপনারা কাজ ফুরোলে ওকে টাকাও দিতেন না, প্রাণেও মারতেন। ওর কপালে ছিল আমাদের গুলি খেয়ে মরার, তাই-ই বোধহয় মরতে এখানে এসেছিল এ বছরে। গ্রাম, ঘর, মা-মরা মেয়ে ছেড়ে।"

ডবসন হঠাৎ বলল, তিতিরের দিকে চেয়ে, "আমার কাস্কটা একটু দেবে। গলা শুকিয়ে গেছে।"

তিতির ঋজুদার দিকে চেয়ে ওটা এগিয়ে দিল। বলল, "খেয়ে, কাস্কটা ফেরত দেবেন।"

ডবসন ভয়, বিস্ময় এবং আতঙ্কের চোখে তিতিরের দিকে চেয়ে রইল।

তিতির আমার দিকে চোখের কোণ দিয়ে একটু গর্ব-গর্ব ভাব করে তাকাল।

ঋজুদা হঠাৎ বাংলায় বলল ডবসনকে, "আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে কে? টনাডো? না আপনার নিজেরই ব্রেইনওয়েভ এটা?"

আমি আর তিতির দুজনেই ঋজুদার দিকে তাকালাম। তিতিরের মুখে আতঙ্ক। মাথার পিছনে পিস্তলের নলের মোক্ষম মার খেয়ে বোধহয় ঋজুদার মাথার গোলমাল হয়ে গেছে।

ডবসন ইংরেজিতে বোকা-বোকা মুখে বলল, "বেগ ইওর পার্ডন, মিস্টার বোস?"

ঋজুদা বলল, আবারও বাংলায়, "বলুন, বলুন সাগেসিন, মিস্টার ডবসন।

ডবসন কথা ঘুরিয়ে ইংরিজিতে বললেন, "বাঃ আপনার পাইপের তামাকের গন্ধটা খুবই সুন্দর। আমার সিগার সব ফুরিয়ে গেছে।"

"ডামুর পকেটে নিশ্চয়ই অনেক আছে এখনও। পকেটে কেন, ব্যাগেও আছে। ব্যাগ তো এখানেই।" বলে, আমি যেই ডামুর ব্যাগ খুলতে যাব, অমনি ঋজুদা বারণ করল। বারণ করে, ব্যাগটা চাইল। ব্যাগটা ঋজুদাকে এগিয়ে দিতেই, ঋজুদা তাতে হাত ঢুকিয়ে এক বাক্স সিগার বের করল। হ্যাভানা সিগারের বাক্স। তার পর বাক্সটার ঢাকনি খুলে ধরল। আমরা দেখলাম অনেকগুলো সিগার, মানে চুরুট, সার সার সাজানো আছে।

ঋজুদা আমার আর তিতিরের দিকে তাকিয়ে ঐ বাক্স থেকে একটি সিগার তুলে আমাদের দেখিয়ে বলল, "এই একটি ডিনামাইটই আমাদের সকলকে এই গুহার মধ্যেই জীবন্ত-কবর দিতে পারে। অন্য দুটি আমাদের সমস্ত মালপত্র এবং আমাদের সমেত দুটি জিপকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিতে পারে।" বলেই, ডবসনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এতগুলোর কী দরকার ছিল? আপনারা আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে এত উঁচু ধারণা করেছেন তা জেনে পুলকিত হলাম।"

"এগুলো ডিনামাইট!"

তিতির চোখ বড় বড় করে বলল। সত্যিই তো সিগারের মতোই দেখতে।

আমি তিতিরকে বললাম, "থামো তুমি। ঋজুদার নিশ্চয়ই মাথার গোলমাল হয়েছে। মিস্টার ডব্‌সনের সঙ্গে বাংলায় কথা বলছে, ডামুর সিগারকে ডিনামাইট বলছে।"

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, "না। মাথা খারাপ হয়নি। এগুলো ডিনামাইটই। আর মিঃ ডব্‌সন খুব ভাল বাংলা জানেন। এবং জানেন বলেই, টর্নাডো বাংলা-জানা লোককে খুঁজে বের করে আমাদের পিছনে লাগিয়েছে। ভুষুণ্ডা নিশ্চয়ই আমাদের বাংলায় কথা বলাতে ওর অসুবিধার কথা জানিয়েছিল টর্নাডোর দলকে।"

আমাকে আর তিতিরকে একেবারে চমকে দিয়ে মিস্টার ডব্‌সন বাংলায় বললেন, "হ্যাঁ। তাই। তবে, আমার প্রাণ ভিক্ষা চাই।"

আমরা এবারে আরও বেশি চমকালাম। বাংলা বলার ধরনটা দাদুর বন্ধু কলকাতার সেই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার ফাঁলোর মতন। আমাদের ছেলেবেলায় ফাদার ফাঁলো ফণীদাদুর বাড়িতে খুব আসতেন।

ঋজুদা বলল, "আমরা কেউই খুনী নই যে, কাউকে মারতে হলে আমাদের খুব আনন্দ হয়। আপনার প্রাণ আপনারই থাকবে। কিন্তু বদলে যদি ভুষুণ্ডার প্রাণটি আমরা পাই। সে আমাদের বিশ্বাসী বন্ধু টেডি মহম্মদকে মেরেছে নিষ্ঠুরভাবে, সে আমাদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আমাকেও গুলি করে আহত করেছে। আমি আর রুদ্র যে গতবারে প্রাণে বেঁচে ফিরেছি এটাই আশ্চর্য। তার প্রাণটি আমাদের ভীষণই দরকার। এবং তার সঙ্গে টর্নাডোর খবর।"

"কিন্তু—।"

"কোনোই 'কিন্তু' নেই এর মধ্যে। একেবারে নিষ্কিন্তু হয়ে ভাবুন। এ-ছাড়া কোনো শর্তেই আপনাকে বাঁচাতে পারব না। কাল আমরা এই জায়গা ছেড়ে যাবার সময় আপনাদেরই আনা ডিনামাইট ডিটোনেট করেই আপনার প্রাণের সঙ্গে এই গুহাতেই আপনার বাংলা, ইংরিজি, নৃতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি সব কিছুর জ্ঞান সমেত কবর দিয়ে চলে যাব। বাজে কথা বলার সময় আমাদের নেই। বলুন।"

সার্গেসন ডব্‌সন অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে ঋজুদার দিকে তাকিয়ে

থাকলেন। তাঁর অধ্যাপক-সুলভ ভালমানুষ কমলা-রঙা মুখটা আগুনের আভাতে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। নাকের নীচে এবং থুতনিতে জমাট-বাঁধা কালো রক্ত লেগে থাকা সত্ত্বেও। হঠাৎ তাঁর দুচোখ দিয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ করে জল ঝরতে লাগল।

অবাক কাণ্ড! সাহেবরাও কাঁদে!

আমি আর তিতির মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

মিঃ ডব্‌সন বললেন, "মিস্টার বোস, আপনি বরং আমাকে এখানে কবরই দিয়ে যান। যে জীবন মাথা উঁচু করে স্বাধীন মানুষের মতো, নিজের ইচ্ছা ও খুশিমতো, নিজের সম্মান বাঁচিয়ে কাটানো যায় না, সে জীবনের চেয়ে মরণ অনেক ভাল। টর্নাডো যদি জানতে পারে যে, আমিই তার খবর এবং ভুষুণ্ডার খবর আপনাদের জানিয়েছি তবে তার শাস্তি হবে ভয়ংকর। মৃত্যু তার চেয়ে অনেক বেশি কাম্য। জীবনের যেমন অনেক রকম আছে, মৃত্যুরও আছে। স্বাধীনতাহীন, অন্যর কথায় ওঠা-বসার জীবন আমি চাই না। আর যেই চাক।"

"তাহলে আপনি আমাদের কিছুই বলবেন না?"

"না। মিস্টার বোস। আপনি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের কথা এবং ব্যথা আপনি অন্তত বুঝবেন। ভদ্রলোক হয়ে কথার খেলাপ বা বিশ্বাসঘাতকতা করি কী করে? খারাপ লোকদের মধ্যেও ভাল লোক থাকে। আমি খারাপের মধ্যে ভাল। প্রাণ যায় যাক, আমার দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা হবে না।"

"খুবই মহৎ আপনি। অতি উত্তম। তাই-ই হবে। এখানেই কাল সকালে কবর দিয়ে যাব আমরা আপনাকে।" ঋজুদা বলল।

॥ ৮ ॥

রাতটা ভালয় ভালয় কাটল। হায়নারা বার-তিনেক এসেছিল। পিস্তল দিয়ে ওদের কাছে মাটিতে গুলি করাতে আবার হাঃ হাঃ করে ফিরে গেছিল। শর্ট-ব্যারেলড্ পিস্তলের এই মজা। প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। তারপর এই ফাঁকা, পাহাড়ি জায়গাতে তো কথাই নেই।

ভোরের আলো ফুটতে না-ফুটতে গুহা থেকে সব জিনিসপত্র নামিয়ে

জিপে তুলে তৈরি হয়ে নিলাম। তিতির তাড়াতাড়ি করে একটু পরিজ, মিল্ক-পাউডারের দুধের সঙ্গে বানিয়ে দিল। আর গ্যাজেল-এর স্মোক-করা টুকরো তো ছিলই। মিস্টার ডব্‌সনকে খেতে দেওয়া হল। তাঁর কাছে খাওয়ার জল, টিনের মাছ, সসেজ, ফল, মালটি-ভিটামিন ট্যাবলেটস্ এবং যতখানি স্মোক-করা মাংস ছিল, সব কিছু আমরা দিয়ে গেলাম। ডামুর মৃতদেহ শক্ত হয়ে ফুলে গেছিল ত্রিপলের মধ্যে। ডব্‌সনকেও বলা হয়েছিল সাহায্য করতে। একটু আগে জিপে করে আমরা সকলে নদীতে গিয়ে একটা বড় গাছের গোড়ার কাছে বালি খুঁড়ে ডামুকে কবর দিলাম। ওয়ানাকিরি-ওয়ানাবেরির নাম ভুলে-যাওয়া ডামুকে। মনটা বড় ভারী লাগছিল।

তিতির আমার হাতের পরিচর্যা করছিল যখন, তখন ঋজুদা সার্গেসন ডব্‌সনকে নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। জিপের পেছন থেকে জিনিসপত্রর ম্যাপ দেখে একটি চারকোনা চকচকে বড় টিন বের করল। সেই টিনটার ঢাকনি খুলে তাতে জল মেশাবার পর রাজমিস্ত্রিরা যেমন জিনিস দিয়ে ইটের গাঁথুনিতে সিমেন্ট লাগায় সেই রকম একটি জিনিসও জিপ থেকে বের করল। তারপর, আমাদেরও ডাকল। গুহার মুখে, গুহার উপর থেকে এবং দুপাশ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে প্রকাণ্ড বড় বড় গোলাকার পাথর হাঁসফাঁস করতে করতে নিয়ে এলাম আমরা। পাথরগুলো দিয়ে গুহার মুখ পুরো ভরে দেওয়া হল। বয়ে আনতে হলে একটিও আনার ক্ষমতা আমাদের তিনজনের ছিল না। তারপর সেই সিমেন্টের মতো জিনিসটি দিয়ে পাথরগুলোর মুখে মুখে জোড়া দিতে লাগল ঋজুদা কাদের মিঞা রাজমিস্ত্রির মতন। সিমেন্ট, বালি, চুন-সুরকি শুকোতে সময় লাগে। কিন্তু সিমেন্টের মতো ঐ জিনিসটি ঐ চ্যাপ্টা চামচের মতো জিনিসে করে লাগানো মাত্রই শুকিয়ে যাচ্ছিল। ভিতর থেকে ডব্‌সন বাঁধা হাত দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছিলেন। ঋজুদা ফোকর দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে বলল ইংরিজিতে, "ধাক্কা দিয়ে কোনো লাভ নেই। তবে ভয়ও নেই। আমরা যদি টর্নাডোকে ধরতে পারি, তাহলে আমরাই এসে তোমাকে উদ্ধার করব। আর টর্নাডো যদি আমাদের ধরে, তবে তাকে বলব আপনার কথা। বলব, এমন বিশ্বাসী অনুচর টর্নাডো কেন, কারো

পক্ষেই মেলা সম্ভব ছিল না। তখন সেই-ই নিশ্চয়ই লোক পাঠিয়ে বা নিজে এসে আপনাকে উদ্ধার করবে। আপনি যদি আমার অনুচর হতেন, তাহলে তো নিজেই এসে আপনাকে মুক্ত করতাম, আপনার মতো অনুচর তো অনেক তপস্যা করলেই মেলে।"

ভিতর থেকে ডব্‌সন বার বার বলতে লাগলেন, "আমাকে বাঁচান, আমাকে এভাবে রেখে যাবেন না, প্লিজ ; মিস্টার বোস, প্লিজ।"

ঋজুদা বলল, "তা হয় না। আপনি তো মরেননি। সাপ বা বিছের কামড় অথবা জলাভাব বা খাদ্যাভাব ছাড়া মরার আর কোনো কারণ রইল না। কোনো জানোয়ারই ঢুকতে পারবে না ভিতরে। তবু, মরতে হয়তো পারেন। তবে, সে সম্ভাবনা নিতান্তই কম।"

"তবে, একটা কথা। একটা কথা শুনুন।"

ঋজুদা হঠাৎ খুব মনোযোগী হয়ে উঠল, যেন এই কথাটা শোনার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল। পাথরের ফাঁকে কান লাগিয়ে বলল, "বলুন মিস্টার ডব্‌সন, আমি শুনছি।"

ডব্‌সন বললেন, "আমার ব্যাগের মধ্যে একটি ফ্লেয়ার গান আছে।"

"দেখেছি, আছে। এখন সিগন্যালটা কী তাই বলুন।"

"ওয়ান গ্রিন, ফলোড বাই টু রেড, দেন টু বি কনক্লুডেড বাই ওয়ান গ্রিন।" ডব্‌সন এক নিঃশ্বাসে বললেন।

"প্লিজ রিপিট।" ঋজুদা বলল। ডব্‌সন রিপিট করলেন।

"কিসের সিগন্যাল এটা ?"

"আমি বিপদে পড়লে আমাকে সাহায্য করার সিগন্যাল। টর্নাডোর দলের লোক আমার ফ্লেয়ার গান থেকে এই সিগন্যাল পেলেই আমাকে উদ্ধার করতে আসবে।"

"কিন্তু তারা আপনার বেয়ারিং জানবে কী করে ? আমরা তো অন্য জায়গা থেকেই ছুঁড়ব, যদি ছুঁড়ি।"

"ওরা বেয়ারিং বের করে নেবে ; ওদের কাছে কমপ্যুটার আছে। সে ভাবনা আপনার নয়।"

"ঠিক আছে। আপনার চিন্তা নেই। আমরা এই গুহা থেকে দু-তিন বর্গ-কিলোমিটারের মধ্যেই ছুঁড়ব ফ্লেয়ার। এখন আমরা চলি। ওল্ দ্যা

বেস্ট।"

ভিতর থেকে আওয়াজ হল, "ওল্ দ্যা বেস্ট।"

আমার মনে হল শুনলাম, খোল্ দ্যা খেস্ট।

রওয়ানা হলাম আস্তানা ছেড়ে। এই অল্প কদিন গুহাটাতে থেকে এটাকেই ঘরবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। এমনই বোধ হয় ঘটে। রেলগাড়ির কামরাতে একরাত-একদিন কাটিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে সেই কামরা ছেড়ে নেমে যাবার সময় মনখারাপ লাগে। ঋজুদা একদিন বলছিল আমাদের জীবনটাও রেলগাড়ির কামরারই মতো। যারা এই অল্পদিনের ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় মনখারাপ করে, তারা আসলে বোকা।

ঋজুদার নির্দেশমতো আমরা জিপ চালিয়ে নদীর দিকে চললাম, তারপর নদীর ওপারে যেখানে জঙ্গল খুব গভীর সেখানে পৌঁছে, বড় গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে জিপদুটোকে কামোফ্লেজ করে রাখা হল। ঋজুদা আমার এবং তিতিরের রাক্‌স্যাক্ চেয়ে নিল। বলল, "এতে অতি প্রয়োজনীয় সব জিনিস আমি ভরে দিচ্ছি। তোরা ততক্ষণে আগে যেখানে লোক-চলাচল দেখেছিল তিতির, সেই দিকে নজর রাখ্ দূরবিন নিয়ে উঁচু গাছে চড়ে। বিকেল হলে নেমে এসে আমার কাছে খবর দিবি, কী দেখলি না-দেখলি। দিনের বেলা প্রসেশান করে জিপের ধুলো উড়িয়ে যাওয়ার দিন আমাদের আর নেই। কখন কী ঘটে তার জন্যে সবসময়ই তৈরি থাকতে হবে।"

তিতির আর আমি ঋজুদার কথামতো রাক্‌স্যাক্ নামিয়ে রেখে চলে গেলাম। যাবার আগে ঋজুদাকে বললাম, "ফ্লেয়ার গান থেকে ফ্লেয়ার ছুঁড়লে না তুমি?"

ঋজুদা বলল, "ফ্লেয়ার গান ছুঁড়তে হয় রাতের অন্ধকারে, নইলে আলো দেখা যাবে কী করে? তাছাড়া, ডবসনের কথামতো ফ্লেয়ার গান আমি মোটেই ছুঁড়ব না। ডবসন আমাদের মিথ্যা কথা বলেছে। ডবসন আসলে টর্নাডোর দলের লোকই আদৌ নয়। ও একটি বড় দল নিজে তৈরি করেছে। ডামুর টর্নাডোর দলের উপর রাগ ছিল, বিশেষ করে ব্যক্তিগত রাগ ছিল টর্নাডোর উপর। এই পাজি লোকটা ডামুকে বুঝিয়েছিল যে, আমাদের আর ওদের উদ্দেশ্য এক, টর্নাডোর দলকে শেষ করা; কিন্তু

টর্নাডোর দল শেষ করার পর ডামু কী করে যাবে? বাঙালি বাবুরা কি তার সারাজীবনের দায়িত্ব নেবে? তারা তো ভারতবর্ষে ফিরে যাবে। তার চেয়ে ওর দলে ভিড়ে ডামু টর্নাডোর উপর প্রতিশোধও নিতে পারবে এবং তারপর ডবসনের সঙ্গে মিলে ওরা একাই চুরি করে পশুশিকারের ঢালাও ব্যবসা শুরু করবে। ডামুকে পঞ্চাশ হাজার তান্‌জানিয়ান শিলিং আদপে দিয়েছিল কি না সে সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। লোভকে যে কেবলই বাড়িয়ে চলে তার এমন করেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আমি ডামুকে পঁচিশ হাজার শিলিং অগ্রিম দিয়ে রেখেছিলাম। বাকি আরও পঁচিশ দেব বলেছিলাম আমাদের কাজের শেষে। ডামু ভাবল আমাদের টাকাটা মেরে আবার ও ডবসনের টাকা পাবে এবং ভবিষ্যতেও তার কোনো অভাব থাকবে না। ডবসন জানে না, ওর ফ্লেয়ার গান আমাদের এমন কাজে লাগবে এবং এমন সময় যে ভগবান সদয় হলে আমাদের কাজই হাসিল হয়ে যাবে।

ঘড়িতে তখন বারোটা। আমরা এগিয়ে গেলাম। গলায় বায়নাকুলার ঝোলানো। কোমরে পিস্তল, ছুরি, ছোট্ট জলের বোতল ইত্যাদি। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বড় গাছ দেখতে লাগলাম।

বাওবাব গাছগুলো যে শুধু বড় তাই-ই নয়, এতই বড় যে ভয় লাগে। কত যে তাদের বয়স! অদ্ভুত দেখতে। সাধে কি নাম হয়েছে 'আপসাইড-ডাউন ট্রিজ'! অনেক দূরে একটা বড় বাওবাব গাছ ছিল। একটু এগোতেই দেখলাম, জংলি মৌমাছি উড়ছে তাদের চারপাশে। বাসা বেঁধেছে অনেক। একটা র‍্যাটল্ দৌড়ে গেল সামনে দিয়ে। এই কালো গলার র‍্যাটেল বা হানি-ব্যাজারদের সঙ্গে রুআহা ন্যাশনাল পার্কের মধুচোরদের খুব ভাব। র‍্যাটেল প্রায় কুকুরের মতো কিন্তু তার চেয়ে অনেক ছোট একরকমের জানোয়ার। এরাও আমাদের দেশের ভাল্লুকের মতো মধু খেতে খুব ভালবাসে। তাই চোরা-মধুপাড়িয়েরা মৌচাক ভেঙে মধু পেড়ে নিয়ে কিছুটা রেখে যায় এদের জন্যে। একরকমের পাখি আছে, তাদের নাম ব্ল্যাক-গ্রোটেড্ হানি-গাইড। এরা খুব সহজে চোখে পড়ে না কিন্তু এরাই মধুপাড়িয়েদের পথ-প্রদর্শক। এরা মধুপাড়িয়েদের সোজা নিয়ে হাজির করে মৌচাকের কাছে। তাই, মধু পাড়া হলে মৌচাকের

একটি অংশ রেখে যায় হানি-গাইডের খাবার জন্যে। ওরা ভয় পায়। পথপ্রদর্শককে খাজনা না দিলে, পরে কখনও যদি সে প্রতিশোধ নেবার জন্যে সোজা তাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করে কোনো চিতা বা লেপার্ড বা সিংহের দলের সামনে।

আমাদের সুন্দরবনে, গরান ফুলের মধু খেয়ে যেই মৌমাছি ওড়ে অমনি সেই মৌমাছির পিছু নেয় মৌলেরা। এরা এখানের দারুণ এই হানি-গাইডের সার্ভিস পায়! অবশ্য, সুন্দরবনে মৌমাছির দিকে চোখ রেখে গরান-হ্যাঁতালের বনে বনে নাক উঁচু করে হেঁটে যেতে গিয়েই তো অনবধানে বাঘের খাদ্য হয় বেচারি মৌলেরা। বিপদ এখানেও অনেক। কিন্তু সুন্দরবনের মধুপাড়িয়েরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ঐ ভাবেই জঙ্গলে ঢোকে। এখানের মধুপাড়িয়েরাও নিশ্চয়ই সুন্দরবনের মৌলেদের মতোই গরিব। নইলে হাতি, সিংহ, সাপ, চিতা, লেপার্ড, গণ্ডারের ভয় তুচ্ছ করে এমন সাংঘাতিক ভয়াবহ বনে কি তারা একটু মধু পাড়বার জন্যে ঢুকত। ক' শিলিংই বা রোজগার করে মধু পেড়ে!

বাওবাব গাছটার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। হঠাৎই মানুষের গলার স্বর কানে এল।

আমি তিতিরকে ইশারাতে দাঁড়াতে বলে তাড়াতাড়ি একটা কমব্রেটাম্ ঝোপের আড়ালে ওকে নিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলাম।

ঠিকই তো! দূরের বাওবাব গাছের কাছে কয়েকজন মানুষ কথা বলছে। তিতির ততক্ষণে যে-দিক থেকে কথা আসছিল সেদিকে দূরবিন তুলে ধরেছে। কিছুক্ষণ দেখে ও দূরবিন নামিয়ে বলল, "কী আশ্চর্য!"

"কী!"

"কতকগুলো পাখি! একেবারে মানুষের গলার মতো আওয়াজ।"

আমিও দেখলাম। দেখি, অনেকগুলো বড় বড় পাখি, বড়দিনের আগে নিউ মার্কেটে যেসব সাইজের টার্কি বিক্রি হয় তার চেয়েও বড়, কালো গা, লাল গলা-বুক। ডানার দিকটা সাদা আর তাদের ইয়া বড় বড় লম্বা কালো কালো ঠোঁট—আমাদের দেশের ধনেশ পাখির মতো। পাখিগুলো পাতা ও মাটিতে কী যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ কী। একটার মুখে যে একটা সাপ! পেটের কাছে কামড়ে ধরেছে সাপটাকে বিরাট সাঁড়াশির মতো

ঠোঁটে আর সাপটা কিলিবিলি করছে ঐকেবেঁকে। কী যে ব্যাপার কিছুই বোঝার উপায় নেই। একেবারে ভুতুড়ে কাণ্ড। ঠোঁট ফাঁক করে যেই না কথা বলছে, অমনি মনে হচ্ছে মানুষই বুঝি! হুবহু! এ দেশী মানুষেরই মতো গলার স্বর। এ কোন্ পাখি আমি জানি না। ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ফিরে।

ঠিক সেই সময়ই কাণ্ডটা ঘটল। তিতির আমার কোমরে হাত দিল। ওর মুখের দিকে চেয়ে ওর চোখকে অনুসরণ করে তাকাতেই দেখি, একটি চমৎকার বুশ-বাক দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে মুখ করে। সোয়াহিলিতে এদের বলে পোঙ্গো। চমৎকার বাদামি গা, গলার কাছে আর শরীর আর গলা যেখানে মিলেছে সেখানে কেউ যেন তুলি দিয়ে সাদার পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছে। পিছনের পা দুটির উপরে সাদা রঙের ফেটি। দুটি সুন্দর সজাগ কান; আর মাথার উপরে বাঁকানো প্যাচানো শিঙের বাহার, অনেকটা আমাদের দেশের কৃষ্ণসার অথবা চৌশিঙ্গার মতো।

কী হল, বোঝার আগেই পোঙ্গো বাবাজি মাংগো বলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সাপে কামড়াল কি? নাঃ, সাপে কামড়ালে অমন করে পড়ত না। গুলিও কেউ করেনি। শব্দ হত তাতে। তবে?

আমরা খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তিতির মাথা তুলতে যাচ্ছিল। ওর পনি-টেইলে হ্যাঁচকা টান লাগিয়ে মাথা নামিয়ে দিলাম। নিজেও মাথা নামিয়ে নিলাম। কমব্রেটাম ঝোপের লাল টাসল আর চাইনিজ-ল্যাণ্টার্নের মতো ফুলের ঝাড়ের সঙ্গে একেবারে নাক লাগিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলাম। কী যেন নাম এই ফুলগুলোর! কমব্রেটাম তো ঝাড়ের নাম। এদের একটা বটানিকাল নামও আছে। মনে পড়েছে। পারপারফালিয়া। ঋজুদা বানানের কারণে ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল পুরপুরফুলিয়া। তাই-ই মনে আছে। বর্ষাকাল ছাড়া সব সময় ফুল ফোটে এই ঝোপে।

বুশ-বাকটা পড়েই রইল। নিথর হয়ে। এমন সময় একজন রোগা টিঙটিঙে নিগ্রো লোক দেখা গেল। তার পরনে আমাদের দেশের জঙ্গলের লোকের মতোই একটি নেংটি কিন্তু তফাৎ এই যে, তা রঙিন। তার হাতে একটি ধনুক। লোকটি এসে বুশ-বাকটির পাশে দাঁড়াল। তারপর যে বাওবাব গাছে চড়ে আমরা চারদিক দেখব ঠিক করেছিলাম, সেই দিকেই

তাকিয়ে কাকে যেন ডাকল। আমাদের দিকে পিছন ফিরতেই আমরা সাবধানে, নিঃশব্দে আরও একটু পেছিয়ে গিয়ে একটি ঝোলামতো জায়গায় গড়িয়ে গিয়ে আড়াল নিলাম। নিতে নিতেই কোমরে হাত দিয়ে দুজনেই পিস্তল বের করে ফেললাম। লোকটার ডাকে সাড়া দিল অন্য দুটো লোক। তারা এগিয়ে আসতে লাগল বুশ-বাকটার দিকে। প্রথম লোকটার হাতে কিন্তু শুধু ধনুকই ছিল। তীর ছিল না। অন্যদের হাতও খালি। ওরা তিনজনে বুশ-বাকটাকে দেখে আনন্দে দুবার নেচে উঠল। ওদের হাতগুলো হাঁটুরও নীচে পড়ে। হাতের আঙুলগুলো কাঁচকলার কাঁদির মতো। বাইরের দিকটা চাইনিজ ইংকের মতো কালো, ভিতরের দিকটা সাদা।

আমরা চুপ করে দেখতে লাগলাম। লোকগুলো বুশ্-বাকটাকে ফেলে রেখে বাওবাব গাছটার কাছে ফিরে গেল। আমরা এবার বুকে হেঁটে-হেঁটে ওদের দিকে এগোতে লাগলাম আড়াল নিয়ে নিয়ে। তিতির, দেখি কোথায় আমার কাছে কাছে থাকবে, কিন্তু আশ্চর্য! চোখের সামনে বিষের তীরের শক্তি দেখার পরও একটুও ভয় না-পেয়ে আমাকে ছেড়ে বাঁ দিক দিয়ে বুকে হেঁটে ঐ লোকগুলোর কাছেই এগিয়ে যেতে লাগল। কী করতে চায় ও? এখনও জানে না ও ঐ ছোট্ট বিষের তীরের একটু যদি গায়ের কোথাওই লাগে তাহলে কী হবে!

কিন্তু এখন সামলানোর বাইরে চলে গেছে ঘটনা। লোকগুলোর প্রায় পঁচিশ মিটারের মধ্যে চলে গিয়ে তিতির উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। দেখলাম, পিস্তল ধরা ডান হাতটা রেখেছে পেটের নীচে, যাতে পিস্তলটা লোকগুলোর নজরে না-পড়ে।

ডানদিকে, লোকগুলোর থেকে একই দূরত্বে আড়াল নিয়ে আমিও সরে গেছি। এবার গাছের গুঁড়িটাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তিতিরের থেকে আমি এখনও অনেক দূরে। গাছের গুঁড়ির নীচে একটা পুঁটলি, কাঠ খুদে তৈরি গোল কলসি মতো একটা। বোধহয় মধু পাড়বে তাতে। দু' জোড়া তীর-ধনুক। আর গোটা দশেক তীর একসঙ্গে বাঁধা। লোকগুলো প্রায় আধা-উলঙ্গ। গায়ে দেওয়ার জন্যে একটা করে রঙিন কিটেঙ্গে। ওরা বোধহয় এই-ই এসে পৌঁছল। মধু পাড়বার আগেই বোধ হয় রাতের

খাওয়ার সংস্থান করে নিল বুশ্-বাকটা মেরে। ওরা যে খুবই গরিব তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

হঠাৎ মেয়েলি কান্নার কুই-কুই-কুই শব্দ কানে এল। সর্বনাশ। তিতির! কী, করতে চায় কী মেয়েটা? নিজেও মরবে। আমাকেও মারবে।

সোয়াহিলিতে কেঁদে কেঁদে কী যেন বলছিল তিতির। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। লোকগুলো ঐ মেয়েলি কান্না শুনে ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর তিতিরকে যখন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখল, তখন আরও চমকে উঠল। একজন তাড়াতাড়ি ধনুকে তীর লাগাল। মাটিতে বর্শা শোয়ানো ছিল, এতক্ষণ দেখিনি, বর্শা তুলে নিল অন্য একজন। কিন্তু ওদের মধ্যে যে বয়স্ক, সর্দার গোছের, সে-লোকটা ওদের যেন বারণ করল। তীর-ধনুক নামিয়ে রাখল বটে, কিন্তু অন্যজন বর্শা ধরেই থাকল তিতিরের দিকে লক্ষ করে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তিতির কী বলছে। কেঁদে কেঁদে বলছে, "নিমেপোটিয়া, নিমেপোটিয়া, নিমেপোটিয়া—" এই কথাটা আমাকেও ঋজুদা শিখিয়েছিল। এর মানে হচ্ছে, আমি হারিয়ে গেছি।

লোকটা তিতিরের কাছে গেল, গিয়ে তিতিরের হাত ধরে ওঠাল। আশ্চর্য! তার হাতে পিস্তল নেই। গেল কোথায়? ম্যাজিক জানে নাকি? নিশ্চয়ই পেটের নীচের কোনো পাথরের আড়ালে বা ঝোপে ও লুকিয়ে ফেলেছে। চালু পার্টি! এমন ঝুঁকির মধ্যেও মাথা একদম কুলফির মতো ঠাণ্ডা।

লোকটা তিতিরের সঙ্গে অনেক কথা বলতে বলতে ওকে গাছের গুঁড়ির কাছে নিয়ে এল। কাঠখোদা কলসি থেকে ওকে কাঠের মগে করে জল খেতে দিল। একটা ইয়া গোদা কলাও খেতে দিল। তিতির তখনও কাঁদছিল, নাক-চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। একবার মাথা নাড়ছিল আর বার বার বলছিল, আমেফুকা, আমেফুকা! শুনে তো আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। বলছে কী? নিশ্চয়ই আমার কথাই বলছে। আমেফুকা মানে, সোয়াহিলিতে, হি ইজ ডেড্। আমাকে মেরে ফেলে ওর লাভ কী হল? এখন আমি মরিই বা কেমন করে আর তিতিরকে এখানে ফেলে যাই-ই বা

কী করে? এমন বিপদে জীবনে পড়িনি। মেয়ে সঙ্গে করে আফ্রিকায় যিনি এসেছিলেন সেই গ্রেট মিস্টার ঋজু বোস্ তো দিব্যি কফি-টফি খাচ্ছেন বোধ হয়, সসেজের সঙ্গে। অথবা, পাইপ ফুঁকছেন। আর আমার কী বিপদ! বিপদ বলে বিপদ!

সর্দারমতো লোকটি তিতিরের পিঠে হাত দিয়ে বলল, "পোলেনি।" মানে, সরি!

লোকটা ভাল। কিন্তু যে-লোকটা বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে লোকটার চোখমুখের ভাব আমার ভাল মনে হচ্ছিল না। তার চোখ ঢুলুঢুলু, মুখ কেমন যেন বেগ্‌নে-বেগ্‌নে। লোকটা পিচিক করে থুতু ফেলেই বলল, "ভুয়া।" তারপর আবার বলল, "ভুয়া"। বলেই চলল—ভুয়া, ভুয়া, ভুয়া।

কথাটার মানে আমি বুঝলাম না। কিন্তু তিতির যেন বুঝল। ওর চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট হল। আমি যেদিকে আছি সেদিকে একবার চোখ ফেলল ও। পিস্তলটা আমার হাতেই ছিল। বুড়ো আঙুলটা সেফ্‌টি-ক্যাচের উপর ছুঁইয়ে রাখলাম। ওরা তিনজন, আমি একা।

কিন্তু আমার কিছুই করতে হল না। সর্দার গোছের লোকটি এবং যে লোকটি বুশ্-বাকটি বিষতীর দিয়ে মেরেছিল তারা দুজনে মিলে সেই বল্লমধারীর উপর পড়ে এমন মার লাগাতে লাগল কলার কাঁদির মতো হাতে যে, সে জিবা, জিবা, জিবা করে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল।

এমন সময় তিতির আবারও সোয়াহিলিতে কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ বাংলায় টেনে টেনে বলল, "ওহ। রুদ্র তুমি ঐখান থেকে চলে গিয়ে ঐকটু দূরে হেঁটে হেঁটে ঐঐসো যেন কিছুই দেখোনি আর আমাকে ভীষণ খুঁজছ। আমি তো হারিয়ে গেছি খুঁজেছ—ও-ও-ও-ও—"

ওরা অবাক হয়ে তাকাল তিতিরের দিকে। আবার তিতির সোয়াহিলিতে ফিরে যাওয়াতে ভাবল, বেশি দুঃখে নিজের ভাষা বেরিয়ে পড়েছিল। চাপতে পারেনি।

তবু, সর্দার একজনকে কী যেন বলল। বলতেই, দেখলাম ঐ বল্লমধারী লোকটাই তরতর করে বাওবাব গাছে উঠতে লাগল। আরে। দেখলাম বড় বড় গজালের মতো কী সব পোঁতা আছে বাওবাবের নরম গুঁড়িতে।

তার উপরই পা দিয়ে দিয়ে উঠছে লোকটা। ও আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল, তাই ও উঠতে না উঠতেই যেদিকে উপরে উঠলেও আমাকে ও দেখতে পাবে না সেই দিকে আড়াল নিয়েই আমি জঙ্গলে নিঃশব্দে দৌড় লাগালাম। দুশো মিটার মতো গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়েই অ্যাবাউট-টার্ন করে 'তিতির, তিতির' বলে ডাকতে ডাকতে বাওবাব গাছের দিকে আসতে লাগলাম ; সোজা নয়—এঁকেবেঁকে, পাছে ওরা সন্দেহ করে। তারপর গাছটার কাছাকাছি এসেও ডান দিকে ইচ্ছে করেই ঘুরে ওদের বাঁয়ে রেখে 'তিতির তিতির' করে দৌড়তে লাগলাম, কাঁটা-পাথরে হোঁচট খেতে খেতে। তিতিরের নাম ধরে এতবার বোধহয় ওর মাও ডাকেনি ওকে জন্মের পর থেকে।

কিন্তু আশ্চর্য। ওরা কেউই আমাকে ডাকল না। ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। ঐ তিতিরের পাকামির জন্যেই আমার কোমরে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও যে-কোনো মুহূর্তে আমার পাঁজরে নিঃশব্দে একটি বিষতীর এসে লাগতে পারে।

এমন সময় হঠাৎ মেঘগর্জনের মতো পেছন থেকে কে যেন ডাকল : জাম্বো! আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই বললাম, "সিজাম্বো।"

পিছন ফিরে দেখি পত্রশূন্য বাওবাব গাছের একটি ডালের উপরে প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে একজন লোক বসে, মাথার উপর হাত তুলে রয়েছে আমার দিকে, সম্ভাষণের ভঙ্গিতে। তার গায়ের লাল আর কালো চাদর হাওয়াতে উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। তার কুচকুচে কালো রঙ, প্রকাণ্ড চেহারা, আর বাওবাব গাছে চড়া তার অদ্ভুত মূর্তি আমাকে ভূষণ্ডির মাঠের কাঁড়িয়া পিরেতের কথা মুহূর্তে মনে পড়িয়ে দিল। কাঁড়িয়া পিরেতকে চোখে দেখিনি যদিও, কিন্তু কল্পনায় দেখেছি অনেক। সে ছিল রোগা টিঙটিঙে, আর এ তো তাগড়াই। হাতি জিরাফ এলাণ্ড-এর মাংস খায়! এ তো আর পোস্ত তরকারি আর কলাইয়ের ডাল খাওয়া ভূত নয়।

আমি বাওবাব গাছের দিকে এগোতে এগোতে লোকটাও নেমে এল। এ আবার কে? এ তো আগে ছিল না।

আমি যেতেই তিতির দৌড়ে এসে আমার উপরে আছড়ে পড়ল। তার চোখ তখন জলে ভেসে যাচ্ছে। হায় আল্লা! কী অ্যাক্টিং, যেন শাবানা

আজমীর মা!

সেই মুহূর্তের পর থেকে আমি নীরব দর্শক হয়ে গেলাম। কারণ তিতির আর কাঙ্গা-ফিটেঙ্গে পরা লোকগুলো অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল। আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও ওরা অনেক কথা বলছিল।

মহা মুশকিলেই পড়লাম! এতদিনে তিতির আমাকে জব্দ করল। ও যদি এখন আমাকে মেরে ফেলতেও বলে, ঐ লোকগুলো বোধহয় তাও ফেলবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিতির হেসে, কেঁদে, গম্ভীর হয়ে লোকগুলোর নেতাই যেন বনে গেল।

কোনো কথাই বুঝতে পারছিলাম না বলেই সন্দেহ হচ্ছিল যে, ওরা বোধহয় সোয়াহিলি নয় ; অন্য কোনো উপজাতিক ভাষায় কথা বলছিল। তবে, লোকগুলোর মুখে ভুযুণ্ডা এবং টনডো এই নাম দুটো বার বার শুনছিলাম। একটু পর ওরা আমাকেও একটু জল আর এক হাত সাইজের একটা কলা খেতে দিল। তারপর সবাই মিলে বুশ্‌বাকটির চামড়া ছাড়াতে লাগল। অবাক হয়ে দেখলাম, তিতিরও ওদের সাহায্য করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিতির রক্ত-টক্ত মেখে একেবারে ভয়ংকরী চেহারা ধারণ করল। বুশ্‌বাকের চামড়াটা যত্ন করে এক পাশে মুড়ে রেখে ওরা আগুন করল।

এদিকে বেলাও আস্তে আস্তে পড়ে আসছে। ঋজুদাও নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে চিন্তা করছে। আমি নিজেও নিজের জন্যে কম চিন্তা করছি না। কিন্তু যেভাবে তিতির লোকগুলোকে অর্ডার করছিল, এমনকী দেখলাম, একজনের নাকও মলে দিল বাঁ হাত দিয়ে এবং যেভাবে ওরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগল তাতে ব্যাপার-স্যাপার তিতিরের কল্যাণে যে ভালর দিকেই এগোচ্ছে তাতে আর সন্দেহ রইল না।

আগুন জোর হলে ওরা বুশ্‌বাকটার সামনের একটি রাং বারবিকিউ করতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। পাশের আগুনের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে আরেকজন ভুট্টা আর ডাল ফেলে, বুশ্‌বাকের মাংস ডুমো ডুমো করে কেটে তাতে দিয়ে 'উগালি' অর্থাৎ আফ্রিকান খিচুড়ি রাঁধতে শুরু করল। টেডি মহম্মদের কথা মনে পড়ে গেল। ও-ও উগালি রেঁধে খাইয়েছিল আমাদের।

আমি বাওবাব গাছে হেলান দিয়ে বসে সামনে চেয়ে ছিলাম, যেদিকে ঋজুদাকে রেখে এসেছি আমরা। সন্ধের ছায়া পড়ছে লম্বা হয়ে বনে প্রান্তরে। দড়াম্ দড়াম্ করে সিংহ ডাকতে লাগল আমাদের পিছন থেকে। নানারকম পাখির আর জন্তু-জানোয়ারের ডাকে সূর্যাস্তবেলার আদিম আফ্রিকা সরগরম হয়ে উঠল।

ওদের কাছ থেকে জল চেয়ে নিয়ে হাত-গায়ের রক্ত মুছল তিতির। তারপর আমার কাছে এসে বলল, "কী খোকা? ভয় পেয়েছ?"

বললাম, "কী, হচ্ছে কী? তুমি করতে চাইছটা কী, একটু খুলে বলবে দয়া করে?"

তিতির বলল, "ছেলেমানুষদের সব কথা বলতে নেই; বললে বুঝবেও না।"

তারপরই বলল, "খোকাবাবু, লেবুঞ্চুস খাবে?"

বলেই ওর জিনস্-এর পকেটে হাত ঢুকিয়ে সত্যিই একমুঠো লজেন্স বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। দেখলাম, লোকগুলো কুমিরের মতো ড্যাবড্যাবে চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। নিলাম একটা। ওদেরও দিল তিতির। তারপর পা ছড়িয়ে বসে ওদের সঙ্গে আবারও গল্প জুড়ে দিল। আবারও মাঝে-মাঝেই ভুযুণ্ডা আর টর্নাডোর নাম শুনতে পেলাম।

এদিকে উগালি আর বুশ্‌বাকের বারবিকিউ বেশ এগিয়েছে বলে মনে হল। ওদের মধ্যে যে বুড়োমতো সর্দার গোছের, সে একফালি পোড়া মাংস কেটে মুখে ফেলে এমন বীভৎস মুখভঙ্গি করল যে মনে হল অজ্ঞানই হয়ে গেল বুঝি। পরক্ষণেই বুঝলাম যে, স্বাদটা যে দারুণ হচ্ছে তারই লক্ষণমাত্র। অন্য একজন একটি কাঠের পাত্রে করে পাথুরে নুন আর ধেড়ে ধেড়ে শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসে ঠিকঠাক করে রাখল একপাশে। ঠিক সেই সময় তিতির হাসিমুখে আমাকে বলল, "খোকাবাবু, এবারে গিয়ে তোমার গুরুদেবকে ডেকে নিয়ে এসো। দুজনে মিলে দুটি জিপই চালিয়ে নিয়ে এসো, তবে হেড-লাইট জ্বেলো না। টর্নাডো এবং তোমাদের পরমপ্রিয় ভুযুণ্ডা কাছাকাছিই আছে। যা শুনলাম আর বুঝছি, তাতে মনে হচ্ছে দিন তিন-চারেকের মধ্যেই মামলার নিষ্পত্তি হবে। অনেকদিন

টুবুল্‌টাকে দেখি না। কলকাতা ফিরব এবারে। বাঙালির মেয়ে, বেশিদিন কি কলকাতা ছেড়ে থাকতে ভাল লাগে!"

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম ও ঠাট্টা করছে কি না।

কিন্তু আমার সন্দেহভঞ্জন করে ও বলল, "যাও খোকা, আর দেরি নয়।"

আমি যখন এগোলাম প্রায়ান্ধকারে তখনও লোকগুলো কোনো আপত্তি করল না।

নাঃ! মেয়েটা আমারই শুধু নয়, ঋজুদারও প্রেস্টিজ একেবারে পাংচার করে দিল। ওই-ই কিনা নেতা বনল শেষে! কী খিট্‌খ্যাল, কী খিট্‌খ্যাল! ছিঃ!

অন্ধকারে পড়েই পিস্তলটা বের করলাম। কখন কোন্ বাবাজির ঘাড়ে গিয়ে পড়ি তার ঠিক কী! সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি। সিংহর বা অন্য জানোয়ারের ভয় আমার নেই, আমার ভয় কেবল সাপের। দেখলেই গা কেমন ঘিনঘিন করে ওঠে। তাছাড়া গতবারে এখানে গাব্বুন ভাইপার যা শিক্ষা দিয়েছিল! তার উপর অ্যালবিনোর সেই পেল্লায় সাপ।

বেশিদূর এগোইনি, তখনও জিপ থেকে বহুদূরে, এমন সময় সামনের একটা গাছ থেকে কেঠো ভূতের মতো ঋজুদার গলা পেলাম। একটি চাপা, সংক্ষিপ্ত শব্দ।

"ইডিয়ট্!"

চমকে বললাম, "কে? কোথায়?"

"তুই! এইখানে!"

"গাছ থেকে নামো!"

"কোথায় ফেলে এলি মেয়েটাকে?"

"মেয়ে!"

"তার মানে?"

"ব্রহ্মদত্যি। তুমি গুরু, গুড়ই রয়ে গেলে, চেলা তোমার চিনি হয়ে বেরিয়ে গেল"

ঋজুদা রাইফেলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "ধর্।"

রাইফেলটা নিতেই, গাছ থেকে ধপ করে নামল। তম্বি করে বলল, "কোথায় সে?"

"রান্না করছে। তোমারও নেমন্তন্ন। আমারও। চল, জিপ দুটো নিয়ে আসি। তিতির যা বলল, তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের কার্যসিদ্ধি হতে আর বিশেষ দেরি নেই।"

"তিতিরকে কাদের হাতে দিয়ে এলি? আচ্ছা বে-আক্কেলে তো তুই!"

"কাদের হাতে আবার? হ্যার প্যালস্। ওল্ড ফেইথফুল প্যালস্। নাইস, ওয়ার্ম গাঈজ; য়্যু নো!"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম ঋজুদাকে।

এবারে জেবড়ে যাওয়া ঋজুদা ধমক লাগাল। বলল, "দেখ্ রুদ্র! বড় ফাজিল হয়েছিস। সবসময় ফাজলামো ভাল লাগে না।"

"আমি কী ফাজলামি করলাম?" জিপের স্টিয়ারিং-এ বসতে বসতে বললাম। "একেই বলে খাল কেটে কুমির আনা! দুগ্ধপোষ্য মেয়েকে অ্যাডভেঞ্চার করাতে এনে তুমি নিজের ক্যাপটেনসিই খুইয়ে বসলে।"

জিপটা স্টার্ট করে বললাম, "হেডলাইট জ্বালিও না। ফলো মি।"

অন্ধকারে ঋজুদার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভাগ্যিস, পাচ্ছিলাম না। ঋজুদা বোধহয় জীবনে এমন অবিশ্বাস্য অবস্থায় কখনও পড়েনি। ব্যাপার-স্যাপার সব তার নিজের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে এ কথা বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া ঋজুদার পক্ষে যে কত কষ্টের তা বুঝি আমি। শুধু নেতাবাই একমাত্র বোঝে, গদি হারানোর যন্ত্রণা!

জিপটাকে অনেকখানি ঘুরিয়ে আনলাম। কারণ মধ্যে একটা নালামতো ছিল এবং বড় বড় পাথরও ছিল। খুব আস্তে আস্তে অন্ধকারে সাবধানে চালিয়ে যখন সেই বাওবাব গাছের নীচে এসে পৌঁছলাম তখন নাটক পুরো জমে গেছে। দেখলাম, তিতির একটা উঁচু পাথরে বসে আছে রানীর মত আর ঐ তিনটি লোক তার পায়ের কাছে বসে গল্প শুনছে। ফুট্-ফাট্ শব্দ করে কাঠ পুড়ছে। কোনো বুড়ির অভিশাপের মতো বিড়বিড় শব্দ করে উগালি শুকোচ্ছে উনুনের হাঁড়িতে।

আমরা জিপ থেকে নামতেই তিতির লাফিয়ে নামল পাথরটা থেকে।

এবং ওর সঙ্গে ঐ তিনজন লোকও চলে এল ঋজুদার কাছে। তিতিরের নির্দেশে, লোকগুলো ঋজুদাকে জাম্বো, জাম্বো করে আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু জবাবে সিজাম্বো বলার পর ঋজুদাকেও চুপ মেরে যেতে হল। আবারও তিতির ওদের সঙ্গে কল্‌কল্ খল্‌খল্ করে কথা বলতে লাগল অনর্গল। কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঋজুদা অস্ফুটে বলল, "ওরা হেহে ডায়ালেক্টে কথা বলছে রে রুদ্র! তিতির এমন অনর্গল হেহে বলতে পারে? আশ্চর্য!"

আমি হেসে বললাম, "হেঁ হেঁ! হেহে! স্যার, নিজের নীচে কখনও নিজের চেয়ে বেশি ওস্তাদ লোককে রাখতে নেই। এবার বোঝো। দেশেও মেয়েমানুষ প্রধানমন্ত্রী, এই আফ্রিকার জঙ্গলে এসেও মেয়েদের কাছেই ছোট হওয়া। ছিঃ ছিঃ। আমারও আর দরকার নেই তোমার এই যাত্রাদলে থেকে। ইন্দিরা গান্ধী আর মার্গারেট থ্যাচারের অধীনস্থ হয়ে অনেক পুরুষ মন্ত্রী হয়ে থাকলে থাকুন; আমি থাকব না। ভটকাইকে নিয়ে আমি নতুন যাত্রাদল খুলব। কী লজ্জা। কী লজ্জা।"

ঋজুদা একটু সামলে নিয়ে জিপ থেকে দু-তিনটে বোতল এনে ঐ লোকগুলোকে দিল। বলল, "ওরা নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছে, বদলে তো ওদেরও কিছু দিতে হয়!"

বললাম, "কী ওগুলো?"

"মৃতসঞ্জীবনী সুরা।"

"খেলে কী হয়?"

"মরা মানুষও জেগে ওঠে।"

"তাহলে আমাকেও দাও একটু। আমি আর বেঁচে নেই। এমন কাটা সৈনিক হয়ে আমি বাঁচব না।"

ঋজুদা এবার পাইপটা জম্পেস্ করে ধরিয়ে বোতলগুলো ওদের দিতেই ওরা আনন্দে আড়াই পাক টুইস্ট নেচে নিল। ঋজুদাকে ধন্যবাদ দিল।

আমি বললাম, "দেবে না আমাকে?"

"দেব। তোর জন্যেও এনেছি। সারিবাদি সালসা। খেতে খুব তেতো। নাই-ই বা খেলি। এখন তিতির দেবী কী বলেন আর করেন তা দেখলেই চাঙ্গা হয়ে যাব আমরা।"

ওরা যখন মহোল্লাসে বোতলগুলো নিয়ে মৃতসঞ্জীবনী সুরা খেতে শুরু করল তখন তিতির বলল, "ঋজুকাকা, কেল্লা ফতে ! এই লোকগুলো টেডি মহম্মদ, ভুষুণ্ডা, টর্নাডো এবং ওয়ানাবেরিকেও চেনে। ভুষুণ্ডা ওদের আরেক বন্ধুকেও অমন করে মেরেছে গোরাংগোরো ক্র্যাটারের কাছে। টর্নাডো ওদের দিয়েই সব করায় অথচ পয়সা দেয় না কিছুই। জেল খাটবার সময় ওরা, মার খাবার সময় ওরা আর পয়সা লুটবার সময় টর্নাডোরা। ভুষুণ্ডা নাকি তিনদিন আগে এখানে এসেছে। ওরা চোরা-শিকারের কাজ শেষ করে একটু মধু পেড়ে বাড়ি যাবে বলে এসেছিল এদিকে। ওদের আস্তানাতেই ভুষুণ্ডা আছে। ওদের সঙ্গে মেশিনগানও আছে। এদিকে হাতি মারাই ওদের আসল কাজ। গত এক মাসে চুরি করে তিরিশটি টাস্কার মেরেছে ওরা। সব দাঁত এখনও চালান দিতে পারেনি। ওদের ডেরাতে এখনও পনেরো জোড়া মস্ত মস্ত হাতির দাঁত আছে। ওরা একটা পাহাড়ের গুহাতে ক্যাম্প করে আছে। এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে।"

"মাত্র মাইল ছয়েক দূরে ? বলিস কী রে ? আর তা জেনেও তোরা এখানে আগুন করে বারবিকিউ করছিস আর হুল্লোড় করছিস ? টর্নাডো নিজে যদি ছ'মাইল দূরে থেকে থাকে, তাহলে তার চারদিকে তার চর আর স্নাইপার্সরাও আছে। বারবিকিউ করা বুশ্‌বাক আর উগালি যখন খাবি, তখনই স্নাইপারদের টেলিস্কোপিক-লেন্স লাগানো রাইফেলের গুলি এসে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে আমাদের সবাইকে। ওরাও তো বোকা নয়, তুইও নোস্। এমন মুখামি কেউ করে ? আমি হেহে বুঝি না—কিন্তু আমার ভয় করছে এরাও বোধহয় আমাদের ট্রাপ করছে। যদি তাই-ই করে, তাহলে এবারে আর কাউকেই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না এখান থেকে।"

এই কথাতে, তিতিরের মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে গেল। ও একদৃষ্টে ঐ তিনটি লোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। লোকগুলো বোতল থেকে ঋজুদার দেওয়া মৃতসঞ্জীবনী সুরা খাচ্ছিল আর ছেলেমানুষের মতো হাসছিল। আগুনের আভা ওদের চকচকে কুচকুচে কালো হাঁড়ির মতো মুখ আর সাদা সাদা বড় বড় দাঁতে ঝিলিক মেরে যাচ্ছিল।

তিতির মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বলল, "না ঋজুকাকা। ওরা মানুষ ভাল। মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে গেলে কি অন্য মানুষ বাঁচে ?"

আমি বললাম, "বিশ্বাস তো আমরা ভুষুণ্ডাকেও করেছিলাম গুগুনোগুম্বারের দেশে। লাভ কী হল ? ডামুকেও ত ঋজুদা আবার বিশ্বাস করেছিল।"

"তোমরা মানুষ চেনো না। আমি বলছি এরা মানুষ ভাল। সন্দেহ নিয়ে জীবনে কেউই কিছু পায় না। আওরেঙ্গজেবের এত বড় সাম্রাজ্যও ধ্বংসে হয়ে গেল শুধুই সন্দেহ করে করে। তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তাহলে ওদেরও করতে হবে।"

তিতির কী বলে, দেখবার জন্যে বললাম, "আমি ভাবছি আজ রাত্রেই এই তিনটেকে ঋজুদার সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা দিয়ে সাবড়ে দেব।"

তিতির ফুঁসে উঠল। বলল, "ডোন্ট বি সিলি ! যদি ওদের বিশ্বাসই না করো, তাহলে তুমি আর ঋজুকাকা চলে যাও। আমি ওদের সঙ্গে আছি। আমাকে শুধু কটা ডিনামাইট দিয়ে যাও, আর শিখিয়ে দিয়ে যাও কী করে তা ডিটোনেট্ করতে হয়। আমি একাই টর্নাডো আর ভুষুণ্ডাকে শেষ করে তোমাদের কাছে ফিরে আসব।"

ঋজুদা তিতিরের দিকে তাকিয়ে বলল, "হুমম্।"

"কী ?"

"হুমমমম্।"

"ওদের বিশ্বাস করছ তো ?"

"উঁ। তুই যখন বলছিস। তাছাড়া এখন তুই-ই তো কম্যাণ্ডার। তুই যা বলবি, তাই-ই হবে।"

পনি-টেইল দুলিয়ে তিতির আবার আমাদের তিতির হয়ে গিয়ে হাসল। বলল, "ঠাট্টা কোরো না। তুমি ভাল করেই জানো কে কম্যাণ্ডার ; আর কে নয় !"

এর পর তিতির আবার ওদের কাছে ফিরে গেল। রাক্‌স্যাক্ থেকে কাগজ বের করে ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাথরে বসে একটা ম্যাপ করতে লাগল।

ঋজুদা পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "কী বুঝলেন মিস্টার

কন্দর্পবাবু ?"

"বেশি পেকেছে ! পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে ।"

ফুক করে একটু হেসে উঠল ঋজুদা । বলল, "তুই একটা পাক্কা মেল শভিনিস্ট । মেয়েদের তুই মানুষ বলেই গণ্য করতে চাস না । এটা কুশিক্ষা । আমি তো ভাবছি তিতিরের কথা । যখন ওকে আনব বলে ঠিক করি, তখন কি একবারও ভেবেছিলাম যে, ওর মধ্যে কর্তৃত্ব দেবার এতখানি ক্ষমতা ছিল ? আশ্চর্য ! কতটুকু মেয়ে ।"

আমি রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়লাম । বললাম, "এ কথার মানেটা কী ? তুমি কি তিতিরকে এই ক্রিটিকাল সময়ে নেতা বানিয়ে দিতে চাও নাকি ? তাহলে আমি নেই ।"

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলল, "নেতা কেউ কাউকে বানাতে পারে না রে রুদ্র । নেতা তার নেতৃত্বর দাবিতেই নিজের থেকেই নেতা হয়ে ওঠে । বানানো নেতারা কোনো দিনও ধোপে টেঁকে না । নেতা হওয়ার চেয়েও অনেক বড় গুণ কী জানিস ?"

"কী ?"

"উদারতার সঙ্গে, নিজে বাহাদুরি না নিয়ে অন্যর নেতৃত্ব খুশি মনে মেনে নেওয়া । আমাদের সকলেরই যা উদ্দেশ্য, যে কারণে আমরা সকলে আফ্রিকাতে এসেছি এবারে, তা যদি সিদ্ধ হয়, তাহলে নেতাগিরি আমি করলাম কি তুই করলি তাতে কিছুই যায় আসে না । উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হলেই হল ।"

একটু চুপ করে থেকে বলল,"রুদ্র, যখন বড় হবি, তখন বুঝতে পারবি, আমাদের চমৎকার দেশ, আমাদের ভারতবর্ষ কত বড় হতে পারত, যদি দেশে নেতা-হতে-চাওয়া লোকের চেয়ে নেতা-না-হতে-চাওয়া লোকের সংখ্যা বেশি হত । এ নিয়ে আর কথা নয় । তিতিরকে আমি এবং তুই হাসিমুখে নেতা বলে মেনে নিচ্ছি । উই উইল জাস্ট ওবে হার কম্যাণ্ডস্ । তাতে যা হবার তা হবে । আমাকে ভুমুণ্ডা গুগুনোগুম্বারের দেশে গুলি করার পর তুই-ই তো নেতা হয়েছিলি নিজের থেকেই । মনে নেই ! আমার দেওয়ার অপেক্ষায় কি ছিলি তুই ? ওরে পাগলা, নেতৃত্ব কেড়ে নিতে হয় । সম্মানে আর শ্রদ্ধায় । নেতৃত্ব ভিক্ষা চেয়ে কেউই কোনোদিন

পায় না । এবারে তিতির আমার এবং তোর কাছ থেকে নেতাগিরি কেড়ে নিয়েছে ; আমাদের সকলের ভালর জন্যে, ওর যোগ্যতার দাবিতে । এ নিয়ে আর একটিও কথা নয় । অ্যাডভেঞ্চারার হবি, স্পোর্টসম্যান হবি আর ক্যাপ্টেনের ক্যাপটেইনসি মানতে সম্মানে লাগবে ? ছিঃ । তা যারা করে, তারা নামেই খেলোয়াড়, নামেই অভিযাত্রী ; আসলে নয় । খেলার মাঠ, অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমি আর মানুষের জীবন আসলে সবই এক । যে লোক খেলার মাঠে ফাউল করে, চুরি করে পেনাল্টি কিক্ নেয়, সে জীবনেও তাই-ই নেয় । তার ছবি বেরোতে পারে একদিন, দুদিন, তিন দিন খবরের কাগজে, কিন্তু সে কারো মনেই থাকে না কখনও । পাকা কিছু, বড় কিছু পেতে হলে, তার ভিত গাঁথতে হয় পাকা করেই । বিবেকানন্দ বলেছিলেন পড়িসনি ? চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না ।"

আমি ভাবছিলাম, বড় জ্ঞান দেয় ঋজুদাটা ! কখন টর্নাডোর আর ভুমুণ্ডার গুলি এসে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেবে সে চিন্তা নেই, শুধু জ্ঞানই দিয়ে যাচ্ছে । নন্‌স্টপ জ্ঞান ।

তিতির এসে খেতে ডাকল আমাদের । প্লাস্টিকের প্লেট আর গ্লাস বের করল ও জিপের পেছন থেকে । বলল, "এসো রুদ্র, এসো ঋজুকাকা ।"

মনে মনে বললাম, ইয়েস ম্যাম্ ।

মুখে কিছুই বললাম না ।

তিতিরের পিছু পিছু হেঁটে গেলাম ।

কেন জানি না, হঠাৎ মনে দারুণ এক গভীর আনন্দ আর শান্তি পেলাম । এখানে এসে অবধি, এসে অবধি কেন, তার আগে থেকেই তিতিরের ব্যাপারে আমার মনে বড় একটা প্রতিযোগিতার ভাব ছিল । কে জেতে ? কে হারে ? কে বড় ? কে ছোট ? এমন একটা ভাব । এই প্রথম, তিতিরের পিছনে পিছনে ঋজুদার পাশে পাশে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎই আমার মনে হল যে, মেনে-নেওয়ার মধ্যে যতখানি বড় হওয়ার ব্যাপার থাকে, জোর করে মানানোর মধ্যে বোধহয় কখনোই তা থাকে না । তক্ষুনি আমি বুঝতে পারলাম যে, এই হেলাফেলায় নিজেকে ছোট করার ক্ষমতা আছে বলেই ঋজুদা আমার অথবা তিতিরের চেয়ে আসলে অনেক অনেক

বড়।

মিথ্যে নেতাদের সত্যি নেতা।

ঋজুদা খেতে খেতে তিতিরকে বলল, "সবই ভাল, শুধু কথাবার্তা একটু আস্তে আস্তে বলতে বল, আর আগুনটা যত তাড়াতাড়ি পারিস নিবিয়ে দে।"

তিতির ওদের সে কথা বলল। ওরা যে সোয়াহিলি জানে না তা নয়, কিন্তু তিতির ওদের সঙ্গে হেহে ভাষায় কথা বলছে ওদের কনফিডেন্স উইন করার জন্যে। হেহে জানাতে ও যত তাড়াতাড়ি ওদের কাছে চলে যেতে পারল, তা সোয়াহিলি বলে সম্ভব হত না।

খেতে খেতেই তিতির বলল, "আই রুদ্র! আমার পিস্তলটার কথা একদম ভুলে গেছিলাম। নিয়ে এসো না প্লিজ।"

"পিস্তল? কোথায় সেটা? কী বিপদ। তোদের বলেছিলাম না, এক মিনিটও হাতছাড়া করবি না!"

তিতির বলল, "সময়কালে পিস্তলটি হাতছাড়া না করলে আমার প্রাণটাই খাঁচাছাড়া হয়ে যেত ঋজুকাকা।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, "কোথায় শুয়েছিলাম আমি তা মনে আছে তো? নাকি যাব আমি?"

"আছে আছে" বলে টর্চটা নিয়ে গিয়ে তিতিরের পিস্তলটা নিয়ে এলাম। একটা পাথরের নিচে রেখেছিল।

তিতির সেটাকে ঐটোমুখেই একটা চুমু খেল, চুঃ করে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে হোলস্টারে ভরল।

খাওয়া-দাওয়া হতে হতেই আগুন নিবিয়ে দেওয়া হল। বুড়োমতো লোকটা বাওবাব গাছের উপরে চড়ে গেল একটা কম্বল কাঁধে নিয়ে। রাতে চারধার দেখবে ও।

ঋজুদা বলল, "তিতির যাইই বলুক, আমি অন্ধ বিশ্বাস করতে রাজী নই এদের। সেটা নেহাতই বোকামি হবে। তিতির ওদের বল, ওরা যেমন বাওয়াব গাছের পেটের মধ্যের বাড়িতে শুয়ে ছিল তেমনই শুতে। আমরা বাইরে থেকে ওদের পাহারা দেব। বুড়ো তো রইল গাছের মাথায়। আমি আর তুই থাকব একটা জিপে। আর রুদ্র পাশেরটায়। আমার বাঁ চোখটা

ক্রমাগত নাচছে। মন বলছে আজ রাতে আমাদের কারোই ঘুমুনোটা ঠিক হবে না।"

"যেমন বলবে।" তিতির বলল।

"রুদ্র, জিপ থেকে আমাদের রাইফেলগুলোও বের কর। সময় হয়েছে। এখনও বের না করে রাখলে, হয়তো বোকাও বনতে হতে পারে।"

"ঠিক আছে।"

বলে, আমি ঋজুদার অর্ডার ক্যারি আউট করতে চলে গেলাম। ফিরে এসে, যার যার রাইফেল স্লিং-এ ঝুলিয়ে অ্যামুনেশন বেল্টসুদ্ধ বুঝিয়ে দিলাম। ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "চাঁদ উঠবে শেষরাতের দিকে। তিতির, বুড়োকে বলে দে; সন্দেহজনক কোনো কিছু দেখলে যেন কথা না বলে। ও যেন স্টার্লিং-এর ডাক ডাকে।"

আমি বললাম, "খুব বললে তো। রাতে কি স্টার্লিং ডাকে নাকি? এ ডাক শুনেই তো স্নাইপার ওকে কড়াক্-পিঙ করে দেবে।"

"দ্যাট্স্ রাইট্! ঠিক বলেছিস। তবে?"

ঋজুদা যেন খুব সমস্যায় পড়েছে এমন মুখ করে বলল।

আমি বললাম, "তোমার পিস্তলের কার্টিজের এম্পটি শেল্গুলো আমি জমিয়ে রেখেছি। ওকে সেগুলো দিয়ে দাও। বলে দাও, কিছু দেখলে ও যেন ঐ এম্পটি শেল্ জিপের বনেটের উপর ছুঁড়ে মারে। তাতে যা শব্দ হবে, তা দূর থেকে শোনা যাবে না।"

তিতির বলল, "চমৎকার! ধাতব শব্দ জঙ্গলে স্বাভাবিক নয়। সামান্য শব্দ হলেও তা অস্বাভাবিক শোনাবে। সে শব্দ ত যারা আসবে তারাও শুনতে পাবে। অত কায়দার দরকার নেই। ওকে বলছি, গাছ থেকে নেমে এসে আমাদের বলবে।"

ঋজুদা বলল, "বাওবাব গাছে তো ডালপালা বেশি নেই। ঐ গাছ থেকে কোনো কিছু দেখে নামতে গেলে, ঐ নড়াচড়া রাতের আকাশের পটভূমিতে চোখে পড়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ কর। নাইলনের দড়ি তো আছেই আমাদের কাছে। ওর ডানপায়ে বেঁধে নিতে বল এক প্রান্ত, আর রুদ্রর বাঁ পায়ে অন্য প্রান্ত।"

তিতির বলল, "রুদ্রর নাকের সঙ্গেই বেঁধে দাও না ঋজুকাকা।"

কিছু বললাম না। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। দেখাব ওকে আমি।

তাইই করা হল। তবে অন্য প্রান্ত আমার পায়ে না বেঁধে একটা সাদা তোয়ালের সঙ্গে বেঁধে সেটা গাছতলায় নামিয়ে দেওয়া হল। তোয়ালেটা আমাদের দিক থেকেই শুধু দেখা যাবে। দড়ি ধরে নাড়লেই তোয়ালেটা নড়বে। ফার্স্ট-ক্লাস বন্দোবস্ত।

ভাল ঠাণ্ডা আছে। পরিষ্কার তারাভরা আকাশ। নানারকম পশু আর পাখির আওয়াজে চতুর্দিক চমকে চমকে উঠছে।

কত কোটি বছর ধরে এই কৃষ্ণমহাদেশের গভীর গহনে কতরকম জন্তু-জানোয়ার আর পশুপাখি রাজত্ব করছে কে জানে! একদিন ছিল, যেদিন মানুষ আর পশুপাখির মধ্যে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক থাকলেও তার মধ্যে ব্যবসায়িক মুনাফার কোনো ব্যাপার ছিল না। মানুষের মস্তিষ্ক যত মারণাস্ত্র তৈরি করছে, ততই তা প্রয়োগ করা হচ্ছে মানুষের নিজেরই মৃত্যুর জন্যে এবং অর্থলোলুপতায় পশুপাখিদের অর্থহীন বিনাশের জন্যে, অগণ্য সংখ্যায়।

ভারী চমৎকার লাগে এই উদোম রাতে বাইরে কাটাতে। এই উদলা জীবন আমাদের দেশেও চমৎকার লাগে। আমাদের দেশের কর্ণাটক, গুজরাটের কোনো কোনো অংশ, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ ছাড়া অন্য বিশেষ কোথাওই আফ্রিকার মতো এমন দিগন্তবিস্তৃত দৃশ্য চোখে পড়ে না।

তিতির কম্বলের তলায় নিজেকে মুড়ে কাড়লি-বেবি হয়ে ঋজুদার পাশে গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আদুরে গলায় বলল, "ঋজুকাকা, একটা গল্প বলো না, ওয়ানাবেবি ওয়ানাকিরির মতো কোনো গল্প—মিথোলজিকাল।"

ঢং দেখে আমার হাসি পেল। কলকাতায় ঠাকুমার কোলের কাছে শুয়ে নীলকমল লালকমলের গল্প শুনলেই হত! যত্ত সব!

ঋজুদাও তেমন। বলল, "গল্প? দাঁড়া ভেব নি।" বলে, পাইপটা ভাল করে ঠেসেঠুসে নিয়ে, যাতে মাঝরাত অবধি চলে, তাতে আগুন জ্বালিয়ে ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। পাইপের একটা সুবিধে এই যে, আগুনটা খোলের মধ্যে থাকে বলে দূর থেকে বা পাশ থেকে রাতের বেলা

তা দেখা যায় না সিগারেটের আগুনের মতো। যদিও, আলো থাকলে ধোঁয়া দেখা যায়। হাওয়া থাকলে পাইপের পোড়া তামাকের গন্ধ উড়ে যায় অনেক পথ। হওয়ার তীব্রতা এবং গন্তব্যর উপর নির্ভর করে তার ওড়া।

ঋজুদা ফিসফিস করে বলল, "শোন্, তবে বলি। রুদ্র, তুইও শোন্। কিন্তু ডানদিকে চোখ রাখিস একটু।

অনেকদিন আগে একজন কালাবার শিকারী ছিল। তার নাম ছিল এফিয়ং। এফিয়ং বুশ-কানট্রিতে থাকত। অনেক জন্তু-জানোয়ার শিকার করে সে পয়সা করেছিল। ঐ অঞ্চলের সকলেই তাকে জানত-চিনত। এফিয়ং-এর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল ওকুন্। উকুন নয় রে, বুঝলি তো তিতির!"

"বুঝলাম। ওদের নামগুলোই তো উদ্ভট উদ্ভট। তারপর?"

"ওকুনের বাড়ি ছিল এফিয়ং-এর বাড়ির কাছে। এফিয়ং ছিল একনম্বরের উড়নচণ্ডি, প্রায় আমারই মতো। খেয়ে এবং খাইয়ে এত পয়সাই সে নষ্ট করল যে, দেখতে দেখতে সে একদিন গরিব হয়ে গেল। খুবই গরিব। শেষে অভাবের তাড়নায় তাকে আবার শিকারে বেরোতে হল। কিন্তু হলে কী হয়, তার ভাগ্যদেবী তাকে ছেড়ে গেছেন বলে মনে হল ওর। যতদিন মানুষের ভাগ্য ভাল থাকে, ততদিন মানুষ ভাবে, তার যা-কিছু ভাল হয়েছে তার সব কৃতিত্ব তারই; তারই একার। কিন্তু ভাগ্যদেবী যেদিন চলে যান ছেড়ে, সেদিন সে বুঝতে পারে তার সব কৃতিত্ব নিয়েও সে মোটেই বেশিদূর এগোতে পারল না। সকাল থেকে সন্ধে অবধি ঝোপেঝাড়ে চুপিসারে ঘুরে ঘুরেও কোনো কিছু ধরতে বা শিকার করতে পারল না ও।

কিছুদিন আগে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এফিয়ং-এর সঙ্গে একটি লেপার্ডের বন্ধুত্ব হয়েছিল। এবং একটি বুশক্যাট-এর সঙ্গেও। একদিন খিদের জ্বালায় এফিয়ং সে তার বন্ধু ওকুনের কাছে গিয়ে দুশো টাকা (রড্স) ধার চাইল। ওকুন এক কথায় সে টাকা দিয়ে দিল। এফিয়ং ওকুনকে এক বিশেষ দিনে তার বাড়িতে আসতে বলল টাকা ফেরত নেওয়ার জন্যে। এও বলল যে, যখন আসবে, তখন যেন তার বন্দুকটা

নিয়ে আসে সঙ্গে করে এবং গুলি ভরেই যেন আনে।

এফিয়ং যেমন করে লেপার্ড ও বুশক্যাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল তেমনভাবেই একদিন শিকারে গিয়ে একটা খামারবাড়িতে রাতে থাকাকালীন সে একটা মোরগ আর একটা ছাগলের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করেছিল। যখন এফিয়ং ওকুনের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় এবং যখন তাকে তার বাড়িতে তা শোধ নিতে আসতে বলে, তখনও কী করে সে এ ধার শুধবে তা জানত না। কিন্তু সে অনেক ভেবে ভেবে বুদ্ধি বের করল একটা। দুবুদ্ধি।

পরদিন সে তার বন্ধু লেপার্ডের কাছে গেল এবং তার কাছ থেকেও দুশো রড্স ধার চাইল। যেদিন ও যে সময়ে ওকুনকে আসতে বলেছিল, সেদিন লেপার্ডকেও বলল তার বাড়ি এসে টাকাটা নিয়ে যেতে। বলল যে, এফিয়ং নিজে যদি বাড়িতে না থাকে, তবে ওর বাড়িতে লেপার্ড যা কিছু পাবে তাইই যেন খায়। এবং তারপর যেন এফিয়ং-এর জন্য অপেক্ষা করে। এফিয়ং এসে টাকা দিয়ে দেবে।

লেপার্ড বলল, ঠিক আছে।

এরপরে এফিয়ং ওর বন্ধু সেই ছাগলের কাছে গেল। গিয়ে তার কাছ থেকেও দুশো টাকা (রড্স) ধার চাইল এবং তাকেও ঐ দিনে ঐ সময়ে তার বাড়িতে যাবার কথা বলল এবং তাকেও বলল, এফিয়ং বাড়ি না থাকলে, তার বাড়িতে যা থাকে তা যেন সে খায় এবং যেন ওর ফেরার অপেক্ষা করে।

এমনি করে বুশক্যাট এবং মোরগের কাছ থেকেও এফিয়ং টাকা ধার করে ওদেরও ঐ একই দিনে টাকা নিতে আসতে বলল একই রকম ভাবে।

সেই দিনে, মানে যেদিন ওকুনের এবং অন্য সবারই আসার কথা, এফিয়ং তার উঠোনে কিছুটা ভুট্টা ছড়িয়ে রাখল। তারপর বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

সে চলে যাবার পরই মোরগ এল। এসে দেখে, এফিয়ং বাড়ি নেই। এদিক-ওদিক ঘুরতেই তার চোখে পড়ল উঠোনে ভুট্টা ছড়ানো আছে। মোরগ এফিয়ং-এর কথা মনে করল, তার বাড়িতে যা পাবে তা খেতে বলার কথা। ভুট্টা খেতে শুরু করল মোরগটা। এমন সময় বুশক্যাটটা

এল। সেও দেখে বাড়িতে এফিয়ং নেই, কিন্তু একটা মোরগ আছে। একমুহূর্তে কুঁক্ কুঁক্ করা মোরগের ঘাড়ে পড়ে সে মোরগকে মেরে, তাকে খেতে লাগল। এমন সময় ছাগলটা এল। এসে দেখে এফিয়ং নেই, কোনো খাবার-দাবারও নেই, থাকার মধ্যে একটা রক্তাক্ত মোরগ-খাওয়া বুশক্যাট। এফিয়ং বাড়ি না থাকায় ছাগল চটে গিয়ে দৌড়ে এসে বুশক্যাটটাকে এমন গুঁতোন গুতোল শিং দিয়ে যে সে একটু হলে প্রাণে মরত। বিরক্ত হয়ে সে আধ-খাওয়া মোরগটা মুখে করে এফিয়ং-এর বাড়ি ছেড়ে ঝোপের দিকে দৌড় লাগাল। কিন্তু এফিয়ং-এর জন্য ওর বাড়িতে অপেক্ষা না করায় ওর শর্তভঙ্গ হল—টাকাটা ফেরত পাবার কোনোই সম্ভাবনা আর ওর রইল না। এমন সময় লেপার্ডটা এল। এসে দেখে এফিয়ং বাড়ি নেই। একটা ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেপার্ডের খিদেও পেয়েছিল। সে ভাবল, এফিয়ংই বুঝি তার জন্যে বন্দোবস্ত করে গেছে। ছাগলটাকে ঘাড় মট্‌কাল লেপার্ডটা। এবং খেতে লাগল। ঠিক এমন সময় এফিয়ং-এর বন্ধু ওকুনও এফিয়ং-এর কথা মতো বন্দুক-হাতে এসে পৌঁছল। সে দূর থেকে দেখল একটা লেপার্ড উঠোনে বসে ছাগল ধরে খাচ্ছে। শিকারী ওকুন তখন চুপিসারে এসে ভাল করে নিশানা নিয়ে ঘোড়া দেবে দিল। লেপার্ড চিতপটাং হয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় এফিয়ং ফিরে এসে ওকুনকে বকাবকি করতে লাগল, তার বন্ধু লেপার্ডকে সে মেরেছে বলে। এফিয়ং এও শাসাল যে, রাজার কাছে সে নালিশ করে দেবে।

ওকুন ভয় পেল এবং রাজাকে বলতে মানা করল।

এফিয়ং বলল, তা কি হয়? বলতেই হবে।

তখন ওকুন আরো ভয় পেয়ে বলল, যাক্ গে যাক্, আমার টাকা তোমাকে শোধ দিতে হবে না, রাজাকে তুমি বোলো না শুধু।

এফিয়ং অনেক ভেবেটেবে কান চুলকে বলল, আচ্ছা। তুমি যখন বলছ। যাও তুমি। এখন আমার বন্ধু লেপার্ডের মৃত শরীরকে কবর দিতে হবে আমায়।

এই ভাবে এফিয়ং মোরগ, বুশক্যাট, ছাগল, লেপার্ড এমন-কী ওকুনের টাকাটাও মেরে দিল।

ওকুন চলে যেতেই, এফিয়ং মরা লেপার্ডকে টেনে এনে তার চামড়া ছাড়াল। তারপর তা শুকিয়ে তাতে নুন ফট্‌কিরি ছড়িয়ে ঠিকঠাক করে রেখে দিল। দূরের গ্রামের হাটে পরে সেই চামড়া নিয়ে গিয়েও বিক্রি করে এফিয়ং অনেক টাকা পেল।"

"তারপর?"

তিতির বলল ফিসফিস করে।

"তারপর আর কী?" ঋজুদা বলল, "এখন, যখনই কোনো বুশক্যাট কোনো মোরগকে দেখে, সে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেরে খায়। মেরে খেয়ে এফিয়ং-এর না-শোধা টাকা উশুল করার চেষ্টা করে।"

"তারপর?"

"তারপর কী?" এই গল্পের একটা মরাল আছে। সেটা হচ্ছে কখনও কোনো মানুষকে টাকা ধার দিবি না।"

"কত টাকা আমার।"

হাসল তিতির।

ঋজুদা বলল, "যখন রোজগার করবি, টাকা হবে যখন, তখন।"

"কেন দেব না?"

"দিবি না এই জন্যে যে, যদি তারা তোর টাকা না শুধতে পারে, তাহলে তোকে তারা মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। অথবা নানাভাবে তোর হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করবে। হয়, বিষ খাইয়ে, নয় তোর উপরে নানা জুজুর ভর করিয়ে।"

"জুজু? জুজু কথাটা বাংলা নয়?"

"সে কোলকাতায় ফিরে সুনীতিদাদুকে জিজ্ঞেস করিস। আমি জংলি লোক, অতশত জানি না। তবে, নাইজেরিয়ার এই এফিক ইবিবিও উপজাতিদের গল্পগাথাতে জুজুর নাম তো পাচ্ছি। জুজু আর জুজুবুড়ি এক কি না, সে বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারিস কোলকাতা ফিরে।"

কতগুলো হায়না এল বুশব্যাক্‌টার মাংসের গন্ধ পেয়ে একটু পরেই। গুগুনোগুম্বারের দেশের অভিজ্ঞতার পর, হায়না জাতটার উপরই ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই এখন। ঋজুদার অর্ডার নেই গুলি

করার। আজ রাত থেকে এই অর্ডার কার্যকর হয়েছে। ওদের দিকে পাথর ছুঁড়ে এবং ঋজুদার খাওয়া মৃতসঞ্জীবনীসুরার বোতল ছুঁড়ে ভাগালাম ওদের।

হায়নাগুলো চলে যাবার পর অনেকক্ষণ নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। তিতিরের ঘুম এখন গভীর। একপাশে আমি, অন্য জিপে ও। আর ওর জিপের ডানদিকে ঋজুদা থাকায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে তিতির। কম ধকল যায়নি বেচারির। যাইই হোক, মেয়ে তো! তবে মেয়ের মতো মেয়ে বটে! ওর পাতলা নিশ্বাসের শব্দ, বনের কোনো উড়াল মাছির ডানার শব্দের মতো ভেসে আসছে আমার নাকে ওর সোয়েটারে স্প্রে করা হালকা পারফ্যুমের গন্ধের সঙ্গে। ভাগ্যিস, গুগুনোগুম্বারের দেশের মতো এখানে সেৎসি মাছির অত্যাচার নেই। থাকলে, আর খোলা জিপে বসে এমন আরামে ঘুমোতে হত না ওকে। আমারও ঘুম-ঘুম পেয়ে গেছে। কাছাকাছি কেউ ঘুমালে বোধহয় ঐ রকমই হয়। ঋজুদা, দেখলাম জিপের সিটে সোজা হেলান দিয়ে বসে, রাইফেলের নলটা ডান পায়ের উপর দিয়ে সিটের বাইরে বের করে দিয়ে রাইফেলের বাঁটের উপর ডান হাত রেখে বাঁ হাতে পাইপ ধরে বসে আছে ডানদিকে চেয়ে।

ঠিক এমন সময় দড়িবাঁধা সাদা তোয়ালেটা যেন একবার নড়ে উঠল। ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল, অনেক সময় গাড়ি চালাতে চালাতে যেমন হয়, যখন মনে হয় গাড়ি যেখানে খুশি যাক, আমার যা খুশি হোক্, একটু শুধু দু'চোখের পাতা বুঁজে নি। ঠিক তেমন। সেই রকম ঘোরের মধ্যেই তোয়ালেটা জোরে বার বার আন্দোলিত হতে লাগল। আমার মাথার মধ্যে ঘুমপাড়ানিয়া কে যেন বলল, 'ঘুমের মতো বিনা পয়সার আশীর্বাদ ভগবান আর দুটি দেননি। ঘুমিয়ে নাও, ভাল করে ঘুমিয়ে নাও।'

ঘুমিয়ে পড়তামও সেই মুহূর্তেই, যদি না কতগুলো শেয়াল ডানদিক থেকে হঠাৎ ডেকে উঠত! ধড়মড়িয়ে ঘুমভাব ছেড়ে উঠতেই দেখি, সাদা তোয়ালেটা তখনও সমানে নড়ে যাচ্ছে মাটি থেকে আধহাত উপরে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল। তোয়ালেটা ক্রমশ মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে লাগল এবং আমাদের জিপের উইণ্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে তাকে আর দেখা গেল না। ব্যাপারটা যে কী হল, তা কিছুই বুঝলাম না। হঠাৎ দেখি,

ঋজুদার জিপ থেকে তিতির নেমে পড়েই অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় নিঃশব্দে গাছটার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড বাওবাব গাছটার গুঁড়ির এ-পাশে একেবারে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধপ্ করে একটা শব্দ হল। ততক্ষণে ঋজুদা রাইফেলটা তুলে নিয়ে তিতিরকে কভার করেছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে জিপের পাশেই—তিতিরের কাছে যাওয়ার কোনো চেষ্টা না করে।

ঐ আবছা অন্ধকারে হঠাৎ দেখলাম গাছের মসৃণ গুঁড়িতে গা ঘষে ঘষে তিতির গাছের অন্য দিকটাতে যাবার চেষ্টা করছে খুব সাবধানে। পৌঁছেও গেল। তারপর কী হল বোঝার আগেই গাছের ওপাশে দু-তিনজন লোকের গলা শুনলাম। তাদের মধ্যে একজন ইংরিজিতে বলল, "ড্যাম ফুল।"

পরক্ষণেই বলল, "লেটস্ শোভ্ অফ্ফ্। কুইক্।"

অন্য কে একজন বলল, "হাউ বাউট্ হিম?"

"কাম অন উা সিলি গোট। লিভ হিম বাহাইণ্ড। উা উইল বি অ্যাজ ডেড অ্যাজ হ্যাম্। উই হ্যাভ অ্যাকসিডেন্টালি এনটার্ড দ্য টেরিটেরিজ অব সামওয়ান।"

ঐ লোকগুলোর মধ্যে একজনের গলাটা ভীষণ চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল আমার। কিন্তু চিনতে পারলাম না।

লোকগুলোর আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই তিতির আমাদের কাছে এল। তখন দেখলাম ওর হাতে ঐ হেহে লোকদের একটি বেঁটে ধনুক আর ছোট্ট তীর।

"খুন করলি তিতির?" ফিসফিস করে ঋজুদা শুধোল।

"কী করব? রাইফেল তো ছুঁড়তে বারণ ছিল!"

"লাগাতে পারলি তীর?"

"লেগে গেল তো! ঈসস্, বুড়োটাকে মেরে ফেলল ওরা। পেছন থেকে আসা তীরটা ওর পিঠে বিঁধেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে ও পেছনে হেলে পড়ায় ওর শরীরের চাপে তোয়ালেটা উঠে আসছিল। যাক্, ওকে যে মেরেছিল, তাকেও আমি মেরেছি, এইটেই মস্ত কথা।"

ইতিমধ্যে গাছের গুঁড়ির ভেতর থেকে অন্যরা বেরিয়ে আসায় ঋজুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল ওদের। ওরা রেগে গিয়ে হাত মুখ

নেড়ে, শব্দ না-করে বলল, কথা তো তোমরাই বলছ!

ঋজুদা তিতিরকে বলল, "ওদের মধ্যে একজনকে নিয়ে আমি আর রুদ্র ঐ লোকদুটোর পিছু নিচ্ছি। তুই অন্যদের সঙ্গে এখানে সাবধানে থাকিস। আশা করছি, রাত ভোর হওয়ার আগেই আমরা ফিরে আসব।"

তিতির ওদের একজনকে ফিসফিস্ করে কী বলল। সে লোকটা এগিয়ে এল। রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে ঋজুদার পিছু পিছু এগোলাম। লোকটা তার বেঁটে তীর-ধনুকটা সঙ্গে নিল।

গাছের ছায়া ছেড়ে বেরিয়েই আমরা একটা পাথরের আড়ালে থেকে কিছুক্ষণ চার ধার দেখে নিলাম। অন্ধকারে আমাদের চোখের চেয়ে জঙ্গলের মানুষদের চোখ অনেক বেশি কাজ করে। লোকটা ভাল করে চারধারে দেখে, আঙুল তুলে আমাদের দেখাল। দেখলাম দুটো লোক জোরে হেঁটে চলছে বাওবাব গাছটার উলটোদিকে।

ঋজুদা লোকটাকে সোয়াহিলিতে আর আমাকে বাংলাতে বলল, ফ্যান-আউট করে লোকদুটোকে ফলো করতে। দরকার হলে ওদের ডেরার ভিতরে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

তাই-ই করলাম আমরা। আসবার সময় ঋজুদা বুড়ো লোকটার পা থেকে খুলে দড়িটা নিয়ে এসেছিল। সেটা কোন্ কাজে লাগবে, কে জানে?

লোকদুটো উঁচু-নিচু জংগলাকীর্ণ পথ বেয়ে চলেছে। নিচু জায়গায় বা নদীর খোলে ঢুকে গেলে দেখা যাচ্ছে না—আবার উঁচু জায়গায় গেলেই দেখা যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে।

একটু পর হঠাৎ ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। পড়তেই, আমরাও শুয়ে পড়লাম। ঋজুদা ওদের সবচেয়ে কাছে এবং একেবারে পেছনে। আমি আর একটু পেছনে, ডানদিকে। এবং হেহে লোকটি বাঁ দিকে, আমার চেয়ে একটু পেছিয়ে।

ঐ লোকদুটো কান খাড়া করে কিছু শোনবার চেষ্টা করতে লাগল এবং ঠিক সেই সময়ই তিতির চিৎকার করে উঠল বাওবাব গাছের তলা থেকে। তারপর গোঙানির মতো করে হেহে ভাষায় কী সব বলতে লাগল টেনে টেনে। আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এক সেকেণ্ড লোকদুটো দাঁড়িয়ে পড়ে তিতিরের ঐ চিৎকার শুনল। যে লোকটা ট্রাউজার আর শুটিং জ্যাকেট পরে ছিল সে এগিয়ে আসতে গেল বটে কিন্তু তার সঙ্গী তাকে জাপটে ধরল এবং উলটোদিকে টানতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তিতির আবার ঐ রকম আর্তনাদ করে উঠল। তখন দুজনেই একসঙ্গে জোরে দৌড় লাগাল।

আমরাও ওদের পেছনে চললাম। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। একটু গিয়েই ওরা একটি টিলার নীচে থেমে গেল। সেখানে একটি গুহামতো আছে। সেই গুহা থেকে আরও একটি লোক নেমে এসে খুব উত্তেজিত ভাবে কী সব কথাবার্তা বলতে লাগল। কথা শুনে মনে হল ওরা সকলেই ইংরিজি জানে এবং এই অঞ্চলের জঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের মতোই অনভিজ্ঞ। যে লোকটাকে তিতির বিষের তীর দিয়ে মারল, সেইই বোধহয় স্থানীয় লোক। ওদের পথপ্রদর্শক। কে জানে? সবই অনুমান।

লোকগুলোকে এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমাদের হাতের রাইফেল দিয়ে তাদের এখুনি সাবড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু শব্দ করা চলবে না এখন। ঐ দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই মনে হল কেন ঋজুদা দড়িটা এনেছিল সঙ্গে করে। দড়িটা ঋজুদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে অনেকখানি ডি-টাওর করে আমি টিলাটার পেছন দিকে চলে গেলাম। ঋজুদার কথামতো হেহে লোকটি সাবধানে লেপার্ড-ক্রলিং করে টিলাটার দিকে এগোতে লাগল। করণ ওর বিষের ধনুক-তীরের পাল্লা বেশি নয়। এবং বিষের তীরই এখন মোক্ষম জিনিস। নিঃশব্দ। তাৎক্ষণিক!

আমি হাঁপাচ্ছিলাম। টিলাটার উপরে পৌঁছে দম নিয়ে নিলাম। তারপর নাইলনের দড়িটাতে একটা ফাঁস লাগালাম বড় করে। আমার শিল্যুট যেন ওদের চোখে না পড়ে এমন করে এগোতে লাগলাম শরীর ঘষে ঘষে। ফোটোগ্রাফিতে যেমন আলো-ছায়ার খেলা বোঝাটাই সবচেয়ে বড় জিনিস, ক্যামোফ্ল্যাজিং-এও তাই। এই আলো-ছায়ার ইনটার-অ্যাকশান যে রপ্ত করতে পারে তার পক্ষে জঙ্গলে লুকিয়ে চলাফেরা করা কোনো ব্যাপারই নয়। ঋজুদা পারে। আমিও হয়তো পারব কোনোদিন।

ওরাও তিনজন, আমরাও তিনজন। আমি জায়গামতো গিয়ে পৌঁছতে লক্ষ করলাম, কিছুটা দূরে ঘনতর ছায়ার মধ্যে ঘন ছায়ার মতো ঋজুদা

একটা উইয়ের ঢিবির আড়াল নিয়ে বসে আছে। আমি ঐ জায়গাতে একটু আগে ছিলাম বলেই আমার পক্ষে ঋজুদাকে স্পট করা সম্ভব হল। হেহে লোকটি চিতারই মতো নিঃসাড়ে টিলাটা থেকে মাত্র পনেরো হাত দূরে একটা ক্যাণ্ডালাগ্রাম ঝোপের আড়ালে এসে পৌঁছেছে। এমন সময় সাহেবি পোশাক পরা লোকটা, যে লোকটা টিলার গুহা থেকে বেরোলো একটু আগে, তাকে বলল, "হুকুম্মা ফেধা?" মানে, ওদের টাকা দাওনি?

লোকটা বলল, "এনডিও, বাওনা।" অর্থাৎ, না স্যার, দিইনি।

বলতেই সাহেবি পোশাক পরা লোকটা দুটো হাত জড়ো করে ঐ লোকটার মাথায় প্রচণ্ড এক বাড়ি মারল কারাটের মারের মতো। কটাং করে একটা শব্দ হল এমন যে মনে হল, লোকটার মাথার খুলিই বা বুঝি ফেটে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার দারুণ আনন্দ হল। এতক্ষণে লোকটার গলার স্বর, লোকটার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, লোকটার—লোকটাকে আমি চিনেছি। একে যখন হাতের কাছে পেয়েছি, তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। প্রাণ যায় তো যাক। ঋজুদা টনার্ডো-ফনার্ডো, আর ডবসন, আর তানজানিয়ান প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নীয়েরে-টিয়েরে বড় ব্যাপার নিয়ে থাকুক। আমি একা ভুষুণ্ডাকে হাতের কাছে পেলেই খুশি। ওকে নিয়ে আমি পুতুল খেলব।

ঐ লোকটা মাথায় বাড়ি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গোঁ-গোঁ করে পড়ে গেল। মাথার খুলিটা নারকেলের মতো সত্যিই ফেটে গেল কি না কে জানে! ভালই হল। হারাধনের ছেলেদের মধ্যে এখন বাকি রইল দুই।

ভুষুণ্ডা বাওবাব গাছটা যেদিকে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, প্যাণ্টের দু' পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে। তারপরই ও নিজের মনে বলল, "ওয়েল, সামথিং হ্যাজ গান অ্যামিস্।"

খুব ইংরিজি ফোটাচ্ছে, বিনা কারণে।

ফাঁসটা আমার করাই ছিল। মাথাটা নিচু করে, টিলার নীচে দড়িটা নামিয়ে দিয়ে বার চারেক দুলিয়ে নিয়ে ভুষুণ্ডার মাথা লক্ষ করে আমি সেটাকে ছুঁড়ে দিলাম। তারাভরা অন্ধকার আকাশের নীচে টেভি মহম্মদ পাহাড়টি নিঃশব্দে আমাকে আশীর্বাদ করল যেন। ফাঁসটা ঠিক উড়ে গিয়ে ভুষুণ্ডার মাথা গলে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ও সেটাকে খুলে ফেলার চেষ্টা

করল বটে দু হাত দিয়ে, কিন্তু আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না। দড়িটাকে আঁকড়ে ধরে আমার শরীরের সমস্ত ওজন সমেত ঝুলে পড়লাম টিলার পেছনে। তারপর মাটি থেকে প্রায় হাত-পনেরো উঁচুতে পাথরের গায়ে ঝুলতে থাকলাম। আমার শরীরের ওজন এবং হ্যাঁচকা টানে ভুষুণ্ডা বেশ কিছুটা হিচড়ে চলে এসে কোনো পাথর-টাথরে আটকে গেল। ওপাশ থেকে একটু দৌড়োদৌড়ির শব্দ শোনা গেল। তারপরই কী হল বোঝার আগেই হঠাৎ ভারশূন্য হয়ে গেলাম আমি। এবং পরক্ষণেই পপাত ধরণীতলে! কে যেন দড়িটা ওপাশে ছুরি দিয়ে কেটে দিল। পড় তো পড়, একেবারে কাঁটাঝোপের উপর।

ঐ অধঃপতিত অবস্থা থেকে প্রাণপণে উত্থান করার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার পেছনে ঋজুদার পরিচিত ঠাট্টার হাসি শোনা গেল। বলল, "রাইফেলটা আমাকে দে। নিজের গুলি খেয়ে যে নিজে মরিসনি, এই ঢের!"

কোনো রকমে উঠে, কাঁটার কামড়ের কথা ভুলে গিয়ে, মুখে সপ্রতিভ হাসি এনে বললাম, "ব্যাপারটা কী হল?"

"ব্যাপার অতীব গুরুতর! ভুষুণ্ডা আমাদের কেসের এগজিবিট নাম্বার ওয়ান। আর তুই তাকেই ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলছিলি? তুই কি ভাবিস, তোর শরীরের ওজন চড়াই পাখির সমান? গলার শিরা-ফিরা বোধহয় ছিঁড়ে গেছে। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। জ্ঞান নেই। এমন করিস না।"

বললাম, "আহা! এ পর্যন্ত কত লোককে নিজে ফটাফট সাবড়ে দিলে আর ভুষুণ্ডার বেলা তোমার যত প্রেম! ও কিন্তু আমার সম্পত্তি। গড়ের মাঠে ভেড়াওয়ালারা যেমন করে ভেড়ার গায়ের লোম কাটে আমি তেমন করেই ওর মাথার কোঁকড়া কালো ঘন চুল ছাঁটব, ওর মাথাটা কোলে নিয়ে। ওর সঙ্গে অনেক হিসেব-নিকেশ আছে আমার।"

ঋজুদার পাইপটা নিভে গেছিল। আগুন জ্বেলে, হেসে বলল, "আহা! যেন ঠাকুমা-নাতির সম্পর্ক! তোর যে কোন্‌টা রাগ আর কোন্‌টা ভালবাসা, বুঝতেই পারি না।"

ঋজুদার গলা শুনে বুঝলাম, খুবই খুশি ঋজুদা।

তারপরই বলল, "নষ্ট করার মতো সময় নেই আমাদের। চল্। যা

বলব, তা মনোযোগ দিয়ে করবি।"

টিলাটার ওপাশে গিয়ে দেখলাম, ভুষুণ্ডা অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে। আর অন্য লোকটা বিষের তীর খেয়ে টেঁসে গেছে। অজ্ঞান হলেও তার হাত-পা বাঁধা আছে দড়ি দিয়ে।

ঋজুদা ঘড়ি দেখল। নিজের মনেই বলল, 'বারোটা! ঠিক আছে। যথেষ্ট সময় আছে। এখানে আয় এক মিনিট।'

টিলাটার ভিতরের গুহাতে গিয়ে চক্ষু স্থির হয়ে গেল। দেখি দুটো মেশিনগান দোপায়ায় বসানো। ঝকঝক করছে টর্চের আলো পড়ে। ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, "ছুঁড়েছিস কখনও?"

"এন-সি-সিতে একবার ছুঁড়েছিলাম। এল-এম-জি।"

"সে তো যত কন্‌ডেমড্ মাল, আর্মির। অ্যাই দ্যাখ, এইটা হচ্ছে ব্রিটিশ ব্রেনগান। ওরিজিনাল ডিজাইনটা চেকোস্লোভাকিয়ার ছিল। ব্রনোর নাম শুনেছিস তো। পয়েন্ট টু-টু রাইফেল দেখেছিলি না একটা, মনে আছে? 'অ্যালবিনোর' রহস্য ভেদের সময় বিষেনদেওবাবুর কাছে, হাজারিবাগের মুলিমালোয়াঁতে?"

"হুঁ!"

"ব্রেনগান কেন বলে তা বুঝলি?"

"কেন?"

"চেকোস্লোভাকিয়ার ব্রনোর ডিজাইনের উপর ইংল্যাণ্ডের এনফিল্ড মক্সো করে এই জিনিস তৈরি করেছে। তাই দুজনের নামই এতে জড়ানো আছে। ব্রনোর বি আর এবং এনফিল্ডের ই এন। বি· আর ই এন—ব্রেন। তাই ব্রেনগান।"

"আর ঐটা কী মেশিনগান? কী সুন্দর! এর তো স্ট্যাণ্ডেরও দরকার হয় না, না?"

"না। এটা আমিও এর আগে দেখিনি। নাম শুনেছি, ছবি দেখেছি। এই টর্নাডো আর ভুষুণ্ডাদের দল যে কত সম্পদশালী আর ওয়েল-ইকুইপড্, ওয়েল-কানেকটেড্ তা এখানে না এলে বুঝতাম না। এইটা ইজরায়েলি লাইট মেশিনগান। নাইন মিলিমিটারের। অত্যন্ত পাওয়ারফুল। এক-একটা ম্যাগাজিনে পঁচিশটা গুলি নেয়। উনিশশো

একারণে ইজরায়েলিরা অন্য দেশের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্যে প্রথম এই উজি তৈরি করে। এই মেশিনগান এমনই কাজের যে, সারা পৃথিবীর মারদাঙ্গা-যুদ্ধবাজদের কাছে এর চাহিদা অসাধারণ। পশ্চিম জার্মানি, ওলন্দাজ এবং অনেক আফ্রিকান দেশের আর্মি এখন এই উজি এল-এম-জিই ব্যবহার করে।"

বলেই বলল, "দেখে নে, কী করে ব্যবহার করতে হয়। দুটোই। তিতির ব্রেনগানটা চালাবে শুয়ে শুয়ে। তুই চালাবি উজিটা। আমাদের রাইফেলগুলো দিবি হেহে লোকগুলোকে, তিতিরের কমাণ্ডে।"

"আর তুমি?"

"আমি একা যাব টর্নাডোর বেস ক্যাম্পে। এখন আর কোনো কথা নয়। তুই এক্ষুনি এই লোকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যা। তিতির এবং ওদের নিয়ে এখানে ফিরে আয়। এলেই সব বুঝিয়ে বলব। আর শোন্! আমার জিপটা চালিয়ে আনবি হেডলাইট না-জ্বেলে। তাতে জিনিসপত্র আছে জরুরি।"

বলেই সার্গেসন-এর জুতোর মধ্যে থেকে ম্যাপটা নিয়ে গুহার মধ্যে টর্চ জ্বেলে বসল।

আমি ফিরে না-গিয়ে রাক্-স্যাক্ থেকে ওয়াকি-টকিটা বের করলাম।

ঋজুদা বিরক্ত হয়ে বলল, ম্যাপের দিকেই চোখ রেখে, "গেলি না তুই?"

ঋজুদাকে গ্রাহ্য না করে ওয়াকি-টকিতে মুখ রেখে সুইচ্ অন করে বললাম, "হ্যালো।"

ওপাশ থেকে তিতিরের রিনরিনে গলা ভেসে এল, "টাঁড়বারো। টিটি।"

বললাম, "টাঁড়বারো—। রুফাস্।"

"গো অ্যাহেড।" তিতির বলল।

ঋজুদা বলে দিয়েছিল, টাঁড়বারো কোড ওয়ার্ড। তিতিরের কোড নেম টিটি। পাখির নাম। আমার কোড নেম রুফাস্। রুফাস্, বাঁদরদের নাম। আমাকে এই কোড নেম দেবার পেছনে তিতির এবং ঋজুদারও গভীর চক্রান্ত ছিল বলেই বিশ্বাস আমার। ঋজুদার নিজের কোড নেম রিংজ্,

প্যারিসের রিংজ্ হোটেলের নামে। ঋজুদা এও বলে দিয়েছিল যে, কথাবার্তা সব বাংলায় বলতে হবে।

তিতির আবার বলল,"বল রুফাস্। শুনছি।"

"ঋজুদার জিপটা নিয়ে ওখানের অন্য সবাইকে নিয়ে এক্ষুনি এখানে চলে এসো। হেড-লাইট জ্বালাবে না। সোজা উত্তরে এসো আধ মাইল। তারপর, আমি টিলার উপরে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে থাকব। সেই আলো দেখে আসবে। সাবধান! গর্তে জিপ ফেলো না। এখন মোক্ষলাভের কাছাকাছি আমরা।"

"আসছি। কোনো খবর আছে? নতুন?"

"আছে। দারুণ খবর। এলেই জানবে। রজার। ওভার।"

টিলার উপরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ বোঝার উপায় রইল না যে, তিতির আদৌ রওয়ানা হয়েছে কিনা। মিনিট দশেক পর রানী মৌমাছির ডানার আওয়াজের মতো জিপের ইঞ্জিনের গুনগুনানি ভেসে এল। আমি টর্চটা জ্বেলে, যাতে উল্টোদিক থেকে না দেখা যায় এমন করে টিলার নীচে আলো ফেলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখতে দেখতে তিতির এসে গেল। ভুষুণ্ডার ততক্ষণে জ্ঞান এসেছে।

আমি বললাম, "হ্যালো, ভুষুণ্ডা! চিনতে পারছ?"

ভুষুণ্ডা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

তিতির তার মাথার দুর্গন্ধ কদমছাঁট চুল দুহাতে নেড়ে দিয়ে বলল,

"ওরে আমার বাঁদর নাচন
আদর গেলা কৌৎকারে,
অন্ধবনের গন্ধগোকুল,
ওরে আমার হোঁৎকা রে।"

ঋজুদা বলল, "এখন ইয়ার্কি মারার সময় নয় তিতির। ভিতরে যা। রুদ্র, তুই শিগগির ওকে ব্রেনগানটা চালানো শিখিয়ে দে। ততক্ষণে আমি জিপটাকে টিলার এ-পাশে এনে লুকিয়ে রাখছি। আপাতত।"

একটু পরে ঋজুদা যখন ফিরে এল, তখন আমরা প্রায় তৈরি। জিপ থেকে ঋজুদা একটা ব্যাগ নিয়ে এল। তার মধ্যে থাক-থাক তানজানিয়ান শিলিং-এর নতুন করকরে নোট।

"এই ব্যাগটা ওদের দিয়ে দে। বলে দে, এখন রেখে দিতে। ওদের কাছেই থাক। আমরা যে টর্নাডো বা ভুষুণ্ডার মতো খারাপ নই তা ওরা জানুক। ভোরবেলা সমানভাগে ভাগ করে নেবে। তার আগে যুদ্ধ করতে হবে ভাল করে ; যদি টর্নাডো যুদ্ধ করে। সামনাসামনি যুদ্ধ করার মতো বোকা সে নয়। তাকে তার ঘাঁটি থেকে বের করে আনতে হবে।" গম্ভীরমুখেই ঋজুদা বলল, "এই সব খুনোখুনি আমাদের কাজ নয়। কিন্তু এবারে প্রথম থেকেই ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে আমরা যেন প্যারা-মিলিটারি কম্যাণ্ডোজ সব। যুদ্ধ করবে তারা ; আমাদের কি এসব মানায় ? ভবিষ্যতে এরকম ঝামেলাতে যাব না আর।"

তারপর আমার হাতে ফ্রেয়ারগানটা দিয়ে বলল, "আমি জিপ নিয়ে চলে যাচ্ছি টর্নাডোর ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্পের যত কাছে যেতে পারি, গিয়ে, তারপর হেঁটে যেতে হবে। জানি না, জিপ নিয়ে কত কাছে যেতে পারব।"

তিতির বলল, "তোমার সঙ্গে উজি এল-এম-জিটাও নিয়ে যাও ঋজুকাকা। একেবারেই একা যাচ্ছ !"

"না। বড্ড ভারী হয়ে যাবে। তাছাড়া আমার দুটো হাতই খালি থাকা চাই। টর্নাডো আর তার দলবলকে আমি এমন শিক্ষা দিতে চাই যে, সারা পৃথিবীর পোচাররা যেন জানে যে, যত বড় বলবান আর অর্থশালীই তারা হোক না কেন, তাদের সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার লোকও আছে। শোন্ রুদ্র। ঘড়িতে যখন ঠিক রাত তিনটে বাজবে, তখন এই ফ্রেয়ারগানটা থেকে আকাশে ফ্রেয়ার ছুঁড়বি। সিগন্যালটা মনে আছে তো ?"

"আমাদের সিগন্যাল ?"

"আঃ। আমাদের কেন ? কোথায় যে মন থাকে তোর ! ডব্‌সনের সিগন্যাল। ডব্‌সনের ডিস্ট্রেস সিগন্যাল দিয়ে আমরা টর্নাডোকে এই টিলার কাছে নিয়ে আসব। এবং টর্নাডো যখন তার আস্তানা ছেড়ে তোদের দিকে আসবে, তখন সেই আস্তানাকেই আমি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব ডিনামাইট দিয়ে। আর তোরা ঐ ব্রেন-গান আর উজি আর তিতিরের হেহে চ্যালারা আমাদের রাইফেল দিয়ে ওদের কচুকাটা করে দিবি।

বুঝেছিস ? এবার বল দেখি সিগন্যালটা কী।"

"ওয়ান গ্রিন, ফলোড বাই টু রেড। দেন টু বি কনক্লুডেড বাই ওয়ান গ্রিন।" তিতির মুখস্থ বলল।

ঋজুদা বলল, "ফাইন্। তাহলে আমি এগোচ্ছি।" বলে, বুড়ো আঙুল তুলে থাম্বস্-আপ্ করল।

আমরাও থাম্বস্-আপ্ করলাম।

তখন বাজে প্রায় সোয়া একটা। ঋজুদার জিপের এঞ্জিনের গুড়গুড়ানির আওয়াজ মিলিয়ে গেল বন-পাহাড়ে। এমন সময় ভুষুণ্ডা বলল, "ওয়াটার !"

আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে তিতিরকে বললাম, "তোমার একজন চ্যালাকে বলো তো ওর মুখে এটা পাকিয়ে পুরে দেবে।"

"তুমি কী নিষ্ঠুর।"

তিতির আবার বলল , "জল দেব ওকে ? আমার ওয়াটার বট্‌লে আছে কিন্তু।"

"আমারও আছে। কিন্তু দেব না। দয়ামায়া আমারও কম নেই তিতির। কিন্তু এ যে ব্যবহারের যোগ্য সেই রকম ব্যবহারই এর সঙ্গে আমাকে করতে দাও। ও আমার চোখের সামনে যদি 'জল জল' করে মরেও যায়, একফোঁটা জলও দেব না ওকে। মরুক।"

তিতির বলল, "যাকগে। মরুকগে ও। কিন্তু কচুকাটার ঠিক ইংরিজি কী, জানো ? ঋজুকাকা কচুকাটা করে দিতে বলে চলে গেল। এরকম অর্ডারের কথা তো কখনও শুনিনি।"

"কচুকাটার আবার ইংরিজি কী ? সাহেবদের দেশে কি কচু হয় ? কচু পুরোপুরি স্বদেশী জিনিস। ওরা বলে, মো-ডাউন ; ঘাস-কাটার জাত তো। আর আমরা বলি, কচুকাটা। কেমন জবরদস্ত কথাটা বলো ?"

"তা ঠিক।"

এদিকে তিতিরের হেহে চ্যালারা টাকার গন্ধ শুঁকে রীতিমত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার উপর মৃতসঞ্জীবনীর প্রভাব এখনও বোধহয় আছে। লোকগুলো একটু বেশি পরিমাণ সঞ্জীবিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কড়া ওষুধের এই দোষ। ডোজের গণ্ডগোল হলেই গলগণ্ড।

যে-বুড়োটা মরল গাছের মগডালে ব্রহ্মদৈত্যের মতো বসে বসেই, সে যে বিশেষ বেশি সঞ্জীবিত হয়েছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই আমার। নইলে, দড়ি ধরে তোয়ালে নাড়তে পারল মগডালে বসে, আর তীর ছুঁড়তে পারল না একটা! বেজ্জারা! ঋজুদা তো ঐ বুড়োটাকে কিছুই দেয়নি। নিশ্চয়ই ওর বৌ-ছেলেদের দেবে কিছু। সব ভালয়-ভালয় মিটুক। ঢুগুণ্ডা যে আমাদেরই হেপাজতে এ-কথাটা এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আড়াইটে এখন ঘড়িতে। আমাদের টেনসান বাড়তে লাগল। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু ঋজুদা যেদিকে গেছে সেদিক থেকে হাতির বৃংহণ আর আমাদের বাওবাব গাছের দিক থেকে হায়েনার বুক-কাঁপানো অট্টহাসি ভেসে আসছে।

তিনটে বাজতে দশ। পাঁচ। তিন।

"হিন্দিতে কাউন্ট-ডাউনকে কী বলে বলো তো?"

তিতির আমাকে শুধোল, ঠিক আড়াই মিনিট যখন বাকি আছে তিনটে বাজতে তখন-।

রাগ ধরে গেল আমার। ফ্লেয়ারগানটা নিয়ে, শেলগুলো ঐ অর্ডারে সাজিয়ে গুহার বাইরে এলাম আমি। উত্তর দিলাম না। ফাক্সা-আলাপের আর সময় পেল না।

তিতির উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল, নিজের মনে, "উলটি-গীনতি।"

ফ্লেয়ারগানটা হাতে করে দাঁড়ালাম। আর ষাট সেকেণ্ড। উনষাট, আটান্ন, সাতান্ন-চলতে লাগল উলটি-গীনতি।

টেনসান একেকজনের মধ্যে এক-একরকম কাজ করে। কেউ স্থির হয়ে যায়, কেউ অস্থির; কেউ আবার ঘুমিয়েও পড়ে। তিতির বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল।

সবুজ আলোয় ভরে গেল আকাশ। তারপর লালে, তারপর আবার সবুজে। ফ্লেয়ারগান ছুঁড়েই আমি এসে জায়গা নিলাম। তারপর তিতিরকে বললাম, "তুমি আর আমি একই জায়গায় থাকলে আমাদের ফায়ারিং-পাওয়ার কার্যকরী হবে না। তুমি এখানে থাকো। আমি টিলার উপরে পাথরের আড়ালে গিয়ে থাকছি। তোমার কাছে একজন হেহেকে

রাখো রাইফেল হাতে। আমি অন্যজনকে নিয়ে যাচ্ছি। টিলার উপরে থাকলে চারদিক দেখাও যাবে। টনডোর দল, ঋজুদা যে পথে গেছে, সেই পথ দিয়েই আসবে তার কী মানে?"

"ঠিকই বলেছ। তাই-ই যাও।" তিতির বলল।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "বেস্ট অব লাক। গুড হান্টিং। সাবধান রুদ্র।"

একটু থেমে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে সব সময় ঝগড়া করি, তোমার পেছনে লাগি বলে তুমি রাগ করো না তো রুদ্র? আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

আমি ওর হাতে চাপ দিয়ে, হাতটা ছেড়ে দিয়ে জ্যাঠামশায়ের মতো গলায় বললাম, "এ সব মেয়েলি কথাবার্তা, ঢং-ঢাং পরে হবে। এখন এসবের সময় নেই। সাবধানে থেকো। লুক্ আফটার ইওরসেলফ্।"

"সো ডু উ্যা!" বলল তিতির।

অন্ধকার কি কেটে যাচ্ছে? নাঃ। দেরি আছে অনেক এখনও ভোর হতে। সব প্রতীক্ষার রাত, সবচেয়ে দীর্ঘতম রাতও ভোর হয় এক সময়। আমাদের এই রাতও আশা করি ভোর হবে। আবার পাখি ডাকবে। আমাদের গায়ে রোদের চিকন বালাপোশ এসে আলতো করে জড়িয়ে নেবে নিজেকে।

বেশ শীত এখন। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে। কী করে যে এতক্ষণ সময় কেটে গেল! আশ্চর্য! হঠাৎ, সামনের প্রায়-নিস্তব্ধ প্রায়ান্ধকার রাতের বুক চিরে দু' জোড়া হেডলাইটের আলো ফুটে উঠল। এবং আস্তে আস্তে আলো যেমনই জোর হতে লাগল, তেমনই জিপের ইঞ্জিনের আওয়াজও জোর হতে লাগল। কাছে আসতেই বুঝলাম, জিপ নয়, ল্যাণ্ডরোভার। তখনও গাড়িগুলো টিলা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে আছে, ঠিক সেই সময়ই মনে হল পৃথিবী বুঝি ধ্বংস হয়ে গেল। নাকি কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হল? অনেক দূরে, আকাশ লালে-লাল হয়ে উঠল। পেট্রলের ড্রাম ফাটার আওয়াজ আর লকলকে আগুনের শিখা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগল আকাশে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ল্যাণ্ডরোভার দুটো আমাদের দিকে আর না এসে, মুখ ঘুরিয়ে যেদিক থেকে

এসেছিল সেদিকেই তীব্রগতিতে ফিরে চলল, অন্ধকার জঙ্গলে আলোর চাবুক মেরে মেরে।

এইবার শুরু হল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পালা। টর্নাডোর অ্যামুনিশান ডাম্প ফাটল নিশ্চয়ই। আগুনে গুলিগোলা ফাটার নানারকম আওয়াজ। এতদূরে বসেও আমরা রাইফেলের বাঁট ছেড়ে দুহাতে কান চেপে ধরলাম। কালা করে দেবে যে! ওখানে কি যুদ্ধ লাগল নাকি? ঋজুদা একা গেল। কী হচ্ছে তা কে জানে!

আমার প্রচণ্ড রাগও হল। আমাদের লড়াই করার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল বলে। পুরো ক্রেডিটটা ঋজুদা একাই নিয়ে নিল! বেশ।

এমন সময় দেখা গেল একজোড়া আলো দ্রুতগতিতে এদিকে আসছে আবার। হাত ঘেমে গেছিল। ট্রাউজারে হাত মুছে নিয়ে আমি উজির বাঁট আবার চেপে ধরলাম। আমার পাশের হেহে লোকটা উত্তেজনায়. এমন অদ্ভুত কুঁই কুঁই আওয়াজ করছিল আর কাঁপছিল যে মনে হচ্ছিল ও বোধহয় মানুষ নয়, অন্য কোনো গ্রহের জীব। ও কিন্তু ভয় পায়নি। ছেলেবেলা থেকে যারা বল্লম দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে সিংহ মারে, তারা ভয় পাওয়ার পাত্র নয়। তাদের মায়েরা তাদের পুতু পুতু করে মানুষ করে না। আসলে বিপদেরও একটা দারুণ অনন্দ আছে। বিপদের তীব্র আনন্দেই ও অমন করছিল।

জিপটা কাছে আসতেই ওয়াকিটকি ব্লিপ্ ব্লিপ্ করতে লাগল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরো চার জোড়া হেডলাইট দেখা গেল। তারা সেই প্রথম জোড়া আলোর চোখকে দ্রুত ফলো করে আসছে।

তিতির প্রথম কথা বলল, "টাঁড়বারো! টিটি।"

"টাঁড়বারো। রিৎজ্। ওরা আমাকে দেখতে পেয়েই তাড়া করেছে। ওরা প্রচণ্ড রেগে রয়েছে। সাবধান। খুব সাবধান। তোরা আগে গুলি করবি না! আমি তোদের টিলার সামনে দিয়ে জিপ চালিয়ে টিলার পেছনে চলে গিয়ে পাকদণ্ডী কাটার মতো করে ওদের পেছনে চলে আসব। শোন্। ওদের কাছে কোনো এল-এম-জি নেই। থাকলে এতক্ষণে আমার চিহ্ন থাকত না। আমাকে গুলি করিস না। মনে রাখিস, ওদের গাড়িগুলো ল্যাণ্ডরোভার। শুধু আমারটাই জিপ। রজার। গড ব্লেস। ওভার!"

"রিংজ্। শুনেছি।" তিতির বলল, "রুফাস্‌কে বলে দেব। রজার। ওভার।"

এতক্ষণে নাটক জমেছে। এই নইলে হয়! কী এতদিন টুকুস-টাকুস করে চলছিল দুস্‌স্‌পায়ে গেঁটে বাত হয়ে যাচ্ছিল। এখন হয় এস্‌পার, নয় উস্‌পার।

গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ওরা পাগলের মতো গুলি ছুঁড়ছে ঋজুদার দিকে। চারটি গাড়ি ওদের। অনেক লোক। আর ঋজুদা একা; তাও নিজেই চালাচ্ছে গাড়ি। ঐকেবেঁকে আর খুব স্পিডে চালিয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বও বাড়িয়ে ফেলেছে অনেকখানি। ব্যাপার-স্যাপার দেখে এবার সত্যিই চিন্তা হতে লাগল।

কিন্তু চিন্তা শেষ হতে না-হতেই প্রচণ্ড হুঙ্কারে আর বেগে গুলি-খাওয়া বাঘের মতো ঋজুদার জিপ আমাদের গুহার মুখ অতিক্রম করে চলে গেল। পেছনের গাড়িগুলো আসছে। আসছে, আসছে; এসে গেল।

উপর থেকে আমি বললাম, "ফা-য়া-র।"

সঙ্গে সঙ্গে তিতিরের ব্রেন-গান আর আমার উজি বৃষ্টি ঝরাতে লাগল। টা'র্যা—র্যা-র্যা-র্যা-র্যা-র্যা-র্যা-র্যা—র্যা—র্যা-র্যা-ট্যা— মধ্যে মধ্যে ম্যাগাজিন রাইফেলের গুলির আওয়াজ। টিক্-চুই, টিক্-চুই, ক্যাট্-ক্যাট্।

প্রথম গাড়িটা উল্টে গেল। আগুন লেগে গেল গাড়িটাতে। বোধহয় ড্রাইভার মরেছে। উল্টোতেই ঐ স্পিডে সামলাতে না পেরে পিছনের গাড়িটাও তার ঘাড়ে এসে পড়েই উল্টে গেল। লোক বেরিয়ে পড়ল তার থেকে। আগুনে ওরা আমাদের পজিশান পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। বিপদ! প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। কিন্তু এদিকেও গুলির বন্যা বয়ে চলেছে। খা, খা, কত গুলি খাবি খা! তোদেরই এল-এম-জি; তোদেরই ম্যাগাজিনে-ঠাসা শ'য়ে শ'য়ে গুলি—খা! পেট পুরে খা পাজি শয়তানগুলো! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! খা!

এমন সময় হঠাৎ আর একজোড়া আলো কোথা থেকে ওদের পেছনে এসে হাজির হল। বাঙালির পো ঋজুদা সৌদরবনের কেঁদো বাঘের চাল চেলেছে। এ-চালের খোঁজ তোরা জানবি কী করে? হেডলাইট নিবিয়ে দিয়ে ডামাডোলের মধ্যে পাকদণ্ডী কেটে জিপ নিয়ে একেবারে পেছনে।

বঙ্গদেশের জোক! চেনোনি তো বাপু!

এদিকে আমাদের কাছেও অজস্র গুলি এসে পৌঁছেছে। প্রথমে মনে হচ্ছিল শিলাবৃষ্টি, যখন দূরে ছিল। এখন মনে হচ্ছে, অনেকগুলো শিলকাটাইওয়ালা দূর থেকে পেল্লায় পেল্লায় ছেনি নিয়ে আমাদের সমস্ত টিলাটা কেটে কেটে মস্ত শিল-পাটা বানাচ্ছে। কী কাটবে এখানে, এত বড় শিলে গাবুক-গুবুক করে কোন যজিবাড়ির রান্না করবে যে তারা, তা তারাই জানে।

কিন্তু আমাদেরও ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরাও সকলে মিলে চালিয়ে যাচ্ছি দে-দনাদ্দন্ দে-দনাদ্দন্। তিতির ঠিকই বলে। আমাদের সঙ্গে ন্যায় আছে, ওদের সঙ্গে অন্যায়। দেরি হতে পারে, কিন্তু অন্যায়কে হারতেই হয় ন্যায়ের কাছে। আমাদের হারাবে কে? কে হারাবে?

এমন সময় ঋজুদা যা করল, তা একমাত্র ঋজুদার পক্ষেই সম্ভব। একেবারে শ্রীকৃষ্ণের রথের মতো একা জিপ নিয়ে চলে এল ঐ ল্যাণ্ডরোভারের মারাত্মক দঙ্গলের মধ্যে। তার জিপ এক-একটা গাড়িকে পেরোয়, আর গদ্দাম্ গদ্দাম্ করে আওয়াজ হয়। হ্যাণ্ড-গ্রেনেড। ঠিক। হ্যাণ্ড-গ্রেনেড। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে, অন্য হাতে গ্রেনেড ধরে, দাঁত দিয়ে পিন্ খুলে জিপ চালাতে চালাতেই ছুঁড়ে দিচ্ছে ঋজুদা গ্রেনেডগুলো। ভটকাই এ দৃশ্য দেখলে বলত: "শোলে-টোলেকে জলে ধুয়ে দিলে র‍্যা! কী ফাইটিং!"

গাড়ির ছাদ-ফাদ আকাশে উড়িয়ে দিয়ে ওদের ল্যাণ্ডরোভারের টায়ার, ওদের হাত পা মুণ্ডু নিয়ে গ্রেনেডগুলো টাগ-ডুম্ টাগ-ডুম্ শব্দে ডাংগুলি খেলতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ই কাণ্ডটা ঘটল। আমাদের টিলার গুহার ভিতর থেকে গড়াতে গড়াতে ভুষুণ্ডা বাইরে বেরিয়ে এল, তারপর "পোলে পোলে", "পোলে পোলে" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে গড়িয়ে নেমে যেতে লাগল দ্রুত।

আমার ট্রিগার ছোঁওয়ানো হাত হঠাৎ থেমে গেল। এক মুহূর্ত। টর্নাডোর দলের লোকেরা প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল তাদেরই হাইডআউট থেকে, তাদেরই এল-এম-জি থেকে, তাদেরই উপর মুড়ি-মুড়কির মতো গুলি-বৃষ্টি হতে দেখে। দ্বিতীয় ধাক্কা খেয়েছিল ঋজুদার টিপিক্যাল

সৌদরবনি পাকদণ্ডীর দণ্ডে। তৃতীয় ধাক্কা খেল তাদেরই পেয়ারের দিগ্বিজয়ের ভুষুণ্ডাকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থাতে এমন করে গড়িয়ে নামতে দেখে।

কিন্তু মুখ দিয়ে 'পোলে পোলে' অর্থাৎ "আস্তে আস্তে" বলল কী করে ভুষুণ্ডা! তার মুখে তো রুমাল ভরা ছিল! এ নিশ্চয়ই তিতিরের কাজ। মেয়েলি দয়া দেখিয়ে মহৎ হতে চেয়েছিল ও। ভুষুণ্ডাকে চেনে না, তাই!

ভুষুণ্ডাকে পড়তে দেখেই ঐ গুলির বৃষ্টির মধ্যেই দুটো লোক দৌড়ে এল ওর দিকে। আমি উজির ব্যারেলটা সামান্য ঘোরালাম। তারপর প্রায় খালি-হয়ে-আসা ম্যাগাজিনটা খুলে নিয়েই নতুন একটা ম্যাগাজিন ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে ট্রিগার টানলাম। আমার হাতের ঘেন্না-মাখা গুলিগুলো সার-সার গিয়ে ভুষুণ্ডাকে ঝাঁঝরা করে ঠেলে এগিয়ে গিয়ে যেন উপরে ধাক্কা দিয়েই মাটিতে ফেলে দিল। বাঁধা হাত-দুটো উপরে তুলে কী যেন বলল ভুষুণ্ডা। শুনতে পেলাম না। সে মাটির উপর লম্বা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আমার হাতের ইজরায়েলি উজি, ভুষুণ্ডাকে একেবারে সুজির হালুয়া বানিয়ে দিল।

চার-চারটি ল্যাণ্ডরোভারই ছেড়ে পালিয়ে গেছে হতভম্ব টর্নাডোর দল। ভুষুণ্ডা ছাড়াও প্রায় পাঁচ-সাতজন লোক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে মাটিতে, মরে ভূত হয়ে। অনেকের হাত-পা-মাথা হ্যাণ্ড-গ্রেনেডে ছিন্নভিন্ন, বাকিরা পালিয়েছে অন্ধকারে।

ততক্ষণে পুবের আকাশ লাল হয়ে এসেছে। সেই লালকে আরও লাল করে তুলে তখনও টর্নাডোর বেস-ক্যাম্পের আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। হঠাৎই লক্ষ করলাম, একটা মোটাসোটা কিন্তু দারুণ লম্বা সাহেবকে তাড়া করে নিয়ে ঋজুদা চলেছে। লোকটা বাওবাব গাছের দিকেই দৌড়চ্ছে। ঋজুদার কোমরে পিস্তলটা আছে বটে ; কিন্তু রাইফেল নেই। আর ঐ লোকটার হাত একেবারেই খালি। তিতিরও ব্যাপারটা দেখেছে বুঝলাম, যখন তিতিরের সঙ্গের হেহে লোকটাই কাটা দড়ির টুকরোটা হাতে নিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঋজুদার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে দেখলাম। নিশ্চয়ই তিতিরেরই ডিরেক্‌শানে। তখন আমিও আমার সঙ্গের লোকটিকে রাইফেল নিয়ে যেতে বললাম ওদিকে।

দেখতে দেখতে ওরা দুজন ঋজুদাদের ধরে ফেলল। আমার সঙ্গে যে-লোকটা ছিল, সে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ঐ লম্বা লোকটার মাথায় এক বাড়ি কষাল। লোকটা ঘুরে পড়ে গিয়েই ওঠবার চেষ্টা করল।

কে লোকটা? ঐ কি টর্নাডো?

ততক্ষণে ঋজুদা এবং ওরা দুজন মিলে তার হাত বেঁধে ফেলেছে পিছমোড়া করে। রাইফেলের নল ঠেকিয়ে রেখেছে আমার সঙ্গীটি তার পিঠে। সে দুহাত উপরে তুলে হেঁটে আসছে। এই-ই তাহলে টর্নাডো! নইলে ঋজুদা এত ইম্‌পর্ট্যান্স দিত না অন্য কাউকে।

সামনে ছড়ানো-ছিটোনো নানা জাতের মানুষের লাশ আর দূরের আগুনের দিকে চেয়ে আমার মনে ঐ হেঁটে-আসা টর্নাডো-নামক লোকটার উপর ভীষণ রাগ কুণ্ডলি পাকাচ্ছিল। ওই-ই এতগুলো লোক খুনের জন্য দায়ী। এবং দায়ী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পশুপাখির অহেতুক খুনের জন্যে।

ভুষুণ্ডার থুবড়ে-পড়া মুখে এখন সকালের রোদ এসে পড়েছে। তিতির গুহার ভিতর থেকে বাইরে এল। আমি নেমে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম। আমার দিকে চেয়ে ও বলল, "হাই! কফাস্! গুড মর্নিং।"

হাসলাম। বললাম, "ভেরি গুড মর্নিং, ইনডিড্।"

ভুষুণ্ডার মুখের উপর রোদ এসে পড়েছিল। রোদ পড়েছিল টেডি মহম্মদ পাহাড়ের গায়েও। ওদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম আমি। তিতির তো আর আমাদের বন্ধু টেডিকে দেখেনি! ভুষুণ্ডার ভয়াবহতার কথাও তার জানা নয়। ও কী করে জানবে "গুণ্ডনোগুণ্ডারের দেশের" ব্যাপার-স্যাপার!

তিতিরও দেখলাম পড়ে-থাকা ভুষুণ্ডার দিকে তাকিয়ে ছিল।

ও আস্তে আস্তে বলল, "রুদ্র! তোমার মনের সাধটা তাহলে মনেই রইল।"

"কী?"

"গড়ের মাঠের ভেড়াওয়ালার মতো ভুষুণ্ডার মাথাটা কোলের উপর শুইয়ে নিয়ে চুল কাটা আর হল না!"

বললাম, "সাধ পূরণ হবার অসুবিধে তো দেখি না! চুল কাটতে চাইলে

মাথার অভাব কি ? তোমার চুল তো ভুসুণ্ডার চুলের চেয়েও অনেক ভাল
ও লম্বা । তোমার চুল কেটেই না হয় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো যাবে ।"
তিতির বসে পড়ে বলল, "হুঁ ! তাই-ই ভাবছ বুঝি ? কত সাধ ! এবার
একটু কফি-টফি খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করো মিস্টার রুদ্রবাবু । একজন
মহিলাকে দিয়ে তো যা নয় তাই করিয়ে নিলে !"
দা গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার মিস্টার ঋজু বোস এগিয়ে আসছিলেন, সাদা
পাহাড়ের মতো টর্নাডোকে নিয়ে ; আমাদেরই দিকে ।

তিতির দু হাত জড়ো করে বলল, "ঋজুকাকা ! প্লিজ একটু কফি খেতে দাও এবারে । আসতে না-আসতেই নতুন অর্ডার কোরো না কোনো কিছু ।"

ঋজুদাও এসে বসল আমাদের পাশে । পাইপের পোড়া-ছাই খুঁচিয়ে ফেলতে লাগল । মুখে কোনো ক্লান্তি নেই। ভূত না ভগবান, বুঝি না কিছু !

তিতির লোকগুলোকে বলল টর্নাডোর হাত ও পা বেঁধে গুহার মধ্যে ফেলে রাখতে । তারপর নিজের সুগন্ধি রুমালটাও বের করে দিল আমার দিকে চেয়ে । বলল, মুখে ঢুকিয়ে দিতে ।

ঋজুদা বলল, "রুদ্র ! যা তো আমার জিপটা কাছে নিয়ে আয় এইখানে । আর জলদি কফি । কফি খেয়ে, সার্গেসন ডব্‌সনকে উদ্ধার করে আন্ গিয়ে । আমি ততক্ষণে দেখি পার্ক হেডকোয়ার্টার্সে আর নীয়েরে সাহেবের সঙ্গে ডার-এস্-সালামে একটু যোগাযোগ করা যায় কি না । ওয়্যারলেস সেটটাও বয়ে নিয়ে আয় । এখন আর ভয় নেই । ডব্‌সনের সব ডিনামাইট লাইন করে লাগিয়ে, আমাদের কালীপুজোর চিনেপটকার মতো ঠুকে দিয়ে এসেছি । ওদিকে সব সাফসুফ । নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু !"

"পটকা তোমার ফার্স্টক্লাস, ঋজুকাকা । আওয়াজটা একটু বেশি, এই-ই যা ।"

আমিও তখনও দাঁড়িয়ে ছিলাম । হঠাৎই, আমাকে জোর ধমক দিল ঋজুদা । "কী, করছিসটা কী তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ! যা না ! সাধে কি তোকে রুফাস্ বলি !"

নেমে যেতে যেতেও দাঁড়ালাম । বললাম, "শোনো ঋজুদা, একটা

প্রমিস্ করতে হবে ।"

"প্রমিস্ ? এই সময় ? কিসের প্রমিস্ ?"

"না । আগে বলো যে করবে !"

"আহাঃ । কী তা বলবি তো । কী মুশকিল রে বাবা !"

"এর পরেরবার যখন কোথাও যাব আমরা, তখন আমাদের সঙ্গে কিন্তু ভট্‌কাইকেও নিয়ে আসতে হবে ।"

"তোমার অর্ডার ?"

"আমার আর্জি ।"

তিতিরের দিকে ফিরে ঋজুদা বলল, "তুই কী বলিস, তিতির ?"

"নাইস্ কম্পানি ; ভট্‌কাই । যা শুনেছি রুদ্রর মুখে । আমাদের চেয়ে বছর-দুয়েকের বড় ; এই যা । ভালই তো । তিনজনের টিমটা কেমন অপয়া-অপয়াও ঠেকে ।"

ঋজুদা বলল, "অপয়া ? তিনজনের টিমই তো সবচেয়ে পয়া বলে মনে হচ্ছে ।"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভট্‌কাই টিমে এলে, ভট্‌কাই-এর উকিল বাদ যাবে । উকিল মক্কেল দুজনকে একসঙ্গে তো আর আনা যাবে না ।"

নামতে নামতে বললাম, "বাঃ । তা তো বলবেই । কাজের বেলায় কাজি ! কাজ ফুরোলে পাজি !"

ঋজুদা আর তিতিরের হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম পেছন থেকে ।

আমারও খুব হাসি পাচ্ছিল । আনন্দের, স্বস্তির হাসি । কত দিন কলকাতা ছেড়ে এসেছি । কাজ শেষ হওয়াতেই মনটা ভীষণ বাড়ি-বাড়ি করছে । মা, বাবা, গদাধরদাদা, মিস্টার ভট্‌কাই । কত দিন মায়ের হাতের রাঁধা শুক্তো খাই না, বাবার সঙ্গে ওয়ার্ড-মেকিং খেলি না ; গদাধরদাদার হাতের মুগের ডালের খিচুড়ি খাই না ; আর চট্‌কাই না ভট্‌কাইকে !

কত্তদিন !

—

ঋজুদা সমগ্র ৫

বুদ্ধদেব গুহ